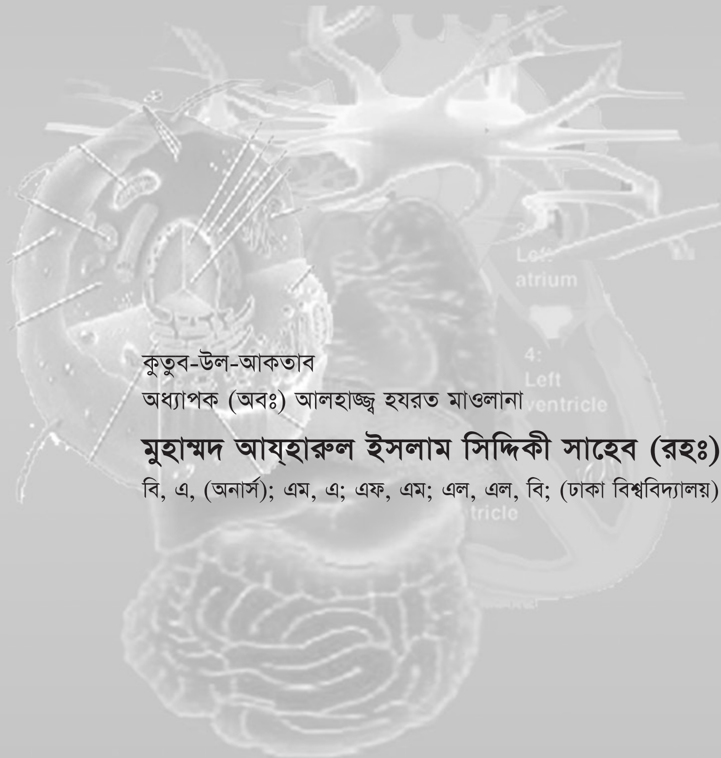
জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব

JIBON RAHASHA O DEHA TATTA

(A Philosophy of Physiology)



কুতুব-উল-আকতাব

অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)

বি, এ, (অনার্স); এম, এ; এফ, এম; এল, এল, বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ

প্রকাশক
মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মন্‌যুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

JIBON RAHASHA O DEHA TATTA (A Philosophy of Physiology)
Written by the great muslim scientist & religious leader of Bangladesh
Prof. Alhajj Hazrat Maulana Muhammad Azharul Islam Siddiquee (Rh.)
Peer Saheb, Manikgonj Darbar Sharif

Published by
Alhajj Hazrat Maulana D. Muhammad Manzurul Islam Siddiquee
Peer Saheb, Manikganj Darbar Sharif
Principal, Zamia Arabia Siddiquea Darul Ulam Madrasa (Siddique Nagar, Manikgonj)
Chairman, Siddiquea Foundation Bangladesh

১ম প্রকাশ	ঃ	১৪০৮ হিজরী, ১৯৮৮ ইংরেজী
দশম সংস্করণ	ঃ	১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ইংরেজী
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ	যুবরাজ মুহাম্মদ মিকদাদ সিদ্দিকী
গ্রাফিকস্ ডিজাইন	ঃ	কম্পিউটার প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল হক
অক্ষর সংযোজন	ঃ	সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
মুদ্রণে	ঃ	জেনিসিস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা, E-mail: genesisl@bdcom.com
মূল্য	:	পেপার ব্যাক টাকা ৬০/-, বোর্ড বাঁধাই ৮০/-
Price	:	Paper Back Indian Rs. 60/-, Board Binding 80/- Europe 5 Euro, US $ 5

ISBN-984-32-1184-7

ভূমিকা

সমগ্র সৃষ্টির ভেতরে মানুষের চেয়ে জটিলতম সৃষ্টি আর নেই। চিরদিনই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, মানুষ কি একাই সৃষ্টি হয়েছে, না কেউ তাকে সৃষ্টি করেছে এবং আরও অন্যান্য বিষয়েও। চিন্তার জগতে উপরোক্ত প্রশ্নকে নিয়ে নাস্তিকতাবাদ এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের ন্যায় দু'টি বিপরীতধর্মী ভাবধারা যুগ-যুগান্তর ধরে চলে আসছে। মানুষ সকল কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও তার নিজের অস্তিত্ব তার নিকট ধ্রুবতারার মতই সত্য। নিজেকে সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না এবং তার নিজস্ব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তাকে কোন প্রকার যুক্তি প্রমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। এই জাজ্জ্বল্যমান অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সিস্টেমগুলোর অস্তিত্ব এবং তাদের নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মধারাকেও মানুষ অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে। এ সকল স্বীকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সিস্টেমগুলোকে এই বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে ধরে এগুলোর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপন, সুশৃঙ্খল ও পরিপূরক কর্মতৎপরতার শক্তি ও নির্দ্দেশ কোত্থেকে প্রাপ্ত হয়, তার উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা এবং প্রমাণ পদ্ধতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। ফিজিওলজি, এনাটমি, বায়োলজি ইত্যাদির স্থিরিকৃত সিদ্ধান্তগুলোর আলোকে মানব দেহাবয়বের পরিকল্পনা ও গঠনে, দেহস্থিত যন্ত্রগুলোর প্রতিনিয়ত বিচিত্র এবং অপরিহার্য্য অলক্ষ্য ক্রিয়াকলাপের পেছনে কোন সে মহাপ্রকৌশলী, মহাশিল্পী এবং মহাশক্তি অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছে, সেই প্রশ্নের জবাব এতে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই মহাশক্তি, মহাপ্রকৌশলী তথা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনকে লাভ করার উপায় সম্পর্কেও আলোকপাত করে দিশেহারা বিভ্রান্ত মানুষকে পথের দিশা দেয়া হয়েছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এ নগন্য প্রচেষ্টা থেকে যদি একটু আনন্দ পান, যদি আপনাদের হৃদয় তৃপ্তি পায়, তবে শ্রম সার্থক মনে করব।

লেখক

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, পীরে কামেল ও মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, শাহ্ সুফি অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) বি.এ. (অনার্স); এম.এ; এফ.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক রচিত যুগান্তকারী অনন্যসাধারণ দার্শনিক রচনা **"জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব"** নামক মহাপুস্তকটি প্রকাশনার পবিত্র দায়িত্ব পেয়ে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহান আল্লাহ্ পাকের নিকট, একত্ব এবং অদ্বিতীয়তা যাঁর গুণ, প্রতাপ, মাহাত্ম্য, গৌরব, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা যাঁর বৈশিষ্ট্য।

চিরদিনই মানুষের প্রশ্ন জেগেছে, মানুষ কি একাই সৃষ্টি হয়েছে? না কেউ তাকে সৃষ্টি করেছে? সৃষ্টি জগতের আরও অন্যান্য বিষয়েও অনুরূপ প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে চিন্তার জগতে অস্তিত্ববাদ এবং নাস্তিকতাবাদ দর্শনের ন্যায় দু'টি বিপরীত ধর্মী ভাবধারা যুগ-যুগান্তর ধরে চলে আসছে। এ সত্ত্বেও মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বের প্রশ্নে এবং ঐ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে, দেহস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রগুলোর প্রতিনিয়ত বিচিত্র এবং অপরিহার্য্য অলক্ষ্য ক্রিয়াকলাপকে সর্বস্তরের মানুষ অকপটে স্বীকার করে। মহান আল্লাহ্ পাক কুর'আনের সুরা হা-মীম সেজদায় ঘোষণা করেছেন, "আমি আমার স্বীয় চিহ্নসমূহ সারা মখলুককে এবং মানবদেহে উহাদিগকে বুঝাইবার জন্য যাহির করিতেছি-এ উদ্দেশ্যে যে, এই সব নিদর্শনের মাধ্যমে সত্যের স্বরূপ যেন উহাদের নিকট যাহির হয়।" দেহস্থিত ঐ সকল স্বীকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সিস্টেমগুলোকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে ধরে ঐ গুলোর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপন, সুশৃংখল ও পরিপূরক কর্মতৎপরতার শক্তি ও নির্দেশ কোত্থেকে প্রাপ্ত হয়, তার উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা এবং প্রমাণ পদ্ধতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। জ্ঞানপিপাসু পাঠককুল চিন্তার সঠিক পথের দিশা এবং আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য লাভে বইটিতে উল্লেখিত পথে উদ্বুদ্ধ হউক-এটাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রকাশনার কাজে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেককে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। সবার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল কামনা করি।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থাকা একান্তই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠককুল তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এটা বিনীতভাবে কামনা করছি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, পীরে মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) ১৯৩৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঘিওর থানার তেরশ্রীর পয়লা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ই সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ্ব অধ্যাপক হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ নছিমুজ্জামান সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ), যিনি তেরশ্রী কলেজের একজন অত্যন্ত উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষক ও হাক্কানী আলেম ছিলেন, তিনি উর্দূ কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। মোর্শেদ কেবলার মাতার নাম সৈয়দা মালেকা সিদ্দিকা (রহঃ) তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদর্শ অনুসারী ও একজন পরহেজগার তাপসী ছিলেন। মোর্শেদ কেবলার দাদাজান ডাঃ সৈয়দ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) তৎকালীন একজন খ্যাতনামা বিলেত ফেরত সার্জন ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষার উচ্চ স্তরের কবি ছিলেন।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন

ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মরণ-শক্তি সম্পন্ন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। যার ফলে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী খুব যত্ন সহকারে তাঁকে পাঠদান করাতেন। তিনি ১৯৫১ সালে ফাযেল পরীক্ষায় বোর্ডষ্ট্যান্ড করেছেন। উল্লেখ্য যে, তখন সমগ্র পাকিস্তানে মাত্র ৪৭ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন। এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি অধ্যায়নের পাশাপাশি জেনারেল বিষয়াদিও অধ্যায়ন করতেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে সম্মানের সহিত বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। পাশাপাশি এল.এল.বি ডিগ্রী লাভ করে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি পেশায় মনোযোগ দেন। মানবিক বিভাগের মেধাবী ছাত্র হলেও তিনি বিজ্ঞান ও আরবী বিভাগের জ্ঞানার্জনে বেশী আগ্রহী ছিলেন। যার ফলে আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানীতে জে্যাতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি আরবী ভাষায় মহাপান্ডিত্য অর্জন করেন, যার ফলশ্রুতিতে

দেশ বিদেশের বহু বরেণ্য আলেম ওলামাগণ নিজ নিজ অর্জিত এলেমকে আমলে পরিণত করার জন্য তালিম ও তাল্‌কিন নিতে তাঁর নিকট ছুটে আসতেন।

তিনি বরাবরই শিক্ষকতাকে পছন্দ করতেন। পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ১৬ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতিটি এতই অভিনব ও মানসম্মত ছিল যে, যখন তিনি ক্লাসে পড়াতেন তখন অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররা তাদের ক্লাস বাদ দিয়ে তাঁর ক্লাস করতে ছুটে আসতো। উল্লেখ্য যে, কোন ছাত্র কখনই বাসায় এসে ক্লাসে পড়ানো বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়নি। তবে তিনি ইংরেজী বিভাগের ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়াতেন। পাশাপাশি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র এক্জামিনার ছিলেন। তিনি সম্মিলিত পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের 'সাইকো এনালাইসিস এসোসিয়েশনের' জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক মহাসাধনা

অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এই আধ্যাত্মিক মহাসাধক জন্মগত আল্লাহ্‌র ওলী ছিলেন। বড় বড় আল্লাহ্‌র ওলীগণ (কুতুব-উল-আকতাব) দুনিয়াতে আসার পূর্বে আল্লাহ্‌পাকের মহাসৃষ্টি জগতের সব কিছু ঐ আল্লাহ্‌র ওলীর জন্য সব সময় দোয়া করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহ্‌পাক দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে পিতা-মাতা, ওস্তাদ অথবা সে সময়ের কোন আধ্যাত্মিক সাধককে অবগত করান। তিনি যখন মাতৃগর্ভে আসলেন তখন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয়া মা স্বপ্নে দেখলেন "স্বয়ং দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাসি মুখে এসে একটি সুন্দর লাল গোলাপ তার হাতে উপহার দিলেন এবং সাথে সাথে বেশ কিছু লাল আলো চতুর্দিকে ছড়াচ্ছিল এবং চারিদিক উজ্জ্বল হয়েছিল" (আলহামদুলিল্লাহ্)। হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন - "আমাকে যদি কেহ স্বপ্নে অথবা বাস্তবে দেখে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম"। শুধু স্বপ্নে দেখলেই জাহান্নামের আগুন হারাম আর হাসি মুখে ফুল দিলে কি হতে পারে-, সাধনা'রত মোকাম্মেল পীরের জ্ঞানী ভক্তবৃন্দ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। যে বিছানায় শিশু মোর্শেদ কেবলা ঘুমাতেন সেই বিছানার পাশের জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পরতো, কিন্তু একটি সাপ এসে জানালায় এমন ভাবে পেচিয়ে ফনা ধরে ছিল, যাতে আল্লাহ্‌র অলীর গায়ে রোদ না লাগে (আলহামদুলিল্লাহ্)। এ ঘটনা দেখে তাঁর পিতা বললেন, "ছেলে হিসেবে খোদা আমাকে একটি রত্ন পাঠিয়েছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সুসংবাদ পেয়েছি যে, আমার এ ছেলের যমানায় ইসলামী দর্শনে ওর চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ হবে না (আলহামদুলিল্লাহ্)"।

খুব ছোট বয়সেই তিনি নির্জনে একা বসে সৃষ্টিজগতের অপূর্ব এই মহাসৃষ্টির মহা

স্রষ্টাকে খুজতেন, আর অঝোরে চোখের পানি ঝরাতেন ও বলতেন কে আমাকে বানিয়েছেন আমাকে দেখা দেন। যখন তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি ভাবলেন আল্লাহ্‌পাককে পেতে হলে আরবী মাধ্যমে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাই তিনি ইংরেজী মাধ্যমের পাশাপাশি মাদ্রাসা বিভাগের পড়া শেষ করেন।

তিনি ১৯৫১ সালে হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল গণি সাহেব (রহঃ) (বনবাসী দরবেশ) এর নিকট বয়াত (মুরিদ) হন এবং ৯ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে সাধনার পর হুজুর কর্তৃক কাদ্‌রীয়া তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর নির্দেশেই চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব হুজুর আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক সাহেব (রহঃ) শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লার (যিনি পানির উপর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পরতেন) নিকট বয়াত গ্রহণ করেন ও এলমে মা'রেফতের জগতে গভীরভাবে বিচরণ করেন এবং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আদব জ্ঞান সম্পন্ন এ মহান আল্লাহ্‌র ওলী তাঁর সঠিক সাধনার মাধ্যমে মাত্র ৩ বছরের মাথায় চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং ১৩ বছর শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লার নিকট সাধনা'রত ছিলেন। বরিশালের হুজুর কেবলা তাঁকে আদর করে "আয্‌হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব" নাম ধরে ডাকতেন এবং মাহ্‌ফিলে শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লা মোর্শেদ কেবলাকে সকল মানুষের সামনে বলতেন "আয্‌হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব খাড়াও (দাঁড়াও) মানুষরে দেহাও (মানুষকে দেখা দাও), এই আয্‌হার আমার কলিজার টুকরা"। মোর্শেদ কেবলা শ্রেষ্ঠ চিশতিয়া ও কাদ্‌রীয়া উভয় তরীকা থেকেই খেলাফত (সনদ) প্রাপ্ত হন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব (রহঃ) (শায়েখ- জামে'আয়ে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, লালবাগ, ঢাকা) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)-কে বলেছিলেন, "আমি আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করেছি, মাবুদ একজন ইংরেজী বাংলা শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষকে আপনি এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেন। আমার এ দোয়া আল্লাহ্ পাকের নিকট যে কবুল হয়েছে, তার প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং আপনি। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেছেন।" (আলহামদুলিল্লাহ্)

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা

১৯৬৫ সালে বরিশালের হুজুর কেবলা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক (রহঃ) এর হুকুম ও দোয়ার মাধ্যমে মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন ও সমগ্র বিশ্বে ইসলামের এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের আলো ছড়িয়ে দেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। মাইলের পর মাইল, কখনো পায়ে হেটে, কখনো সাইকেল চালিয়ে হুজুর কেবলা মাহ্ফিল করতে যেতেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে আনতে লাগলেন। উল্লেখ্য যে, বরিশালের হুজুর কেবলা জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি কখনোই নিজের নামে বয়াত (মুরিদ) করেননি, এটা তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। সমাজে হাক্কানী আলেম তৈরীর লক্ষ্যে এই মহান আল্লাহ্র ওলী ১৯৭৭ সালে জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে আদব, এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফত ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি আরবী, উর্দু, বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিম দেয়া হয়। আধ্যাত্মিক জগতের এই দিকপাল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালিত করে মহান আল্লাহ্পাকের সাথে ভালবাসা স্থাপন করেছেন। মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ হচ্ছে হুজুরপাক (সাঃ)-কে ভালবাসার এবং তাঁর সুন্নতকে সঠিকভাবে মানার দরবার শরীফ। তিনি প্রতি বছর অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে দুইবার বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনের আয়োজন করেন। যেখানে মাত্র তিন দিনে মানুষকে এলমে মা'রেফত ও এলমে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা হুজুরপাক (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ সুন্নত পালনের জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষা দান করা হয়। যেখানে দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও ভক্তবৃন্দ এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফতের তালিম নিতে এবং নবীপ্রেমে মশগুল হয়ে সুন্নতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পাগলের মত ছুটে আসেন। এখানে পর্দা, আদব, আখলাক, এলেম থেকে শুরু করে তাসবিহ্, পাগড়ী, মেস্ওয়াক পর্যন্ত সকল সুন্নতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নেয়া হয়। দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন আলেম-ওলামাগণ মন্তব্য করেছেন- "মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ সুন্নত ও আদবের দরবার"। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ। তার বাস্তব প্রমাণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে গেলে স্বচক্ষে অবলোকন করা যায়।

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও আলেমের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। বর্তমানে মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পিতার নির্দেশ ও দোয়ার মাধ্যমে বাৎসরিক ইসলামী

মহা-সম্মেলন ও মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ অবিকল পিতার মতই পরিচালনা করছেন। বর্তমান পীর সাহেব কেবলা (আব্বা হুজুর) সম্পর্কে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "তোমাদের জন্য আমি দরদভরা একজন দরদী মনের মানুষকে রেখে গেলাম, আমি আমার আমলে যতটুকু ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করেছি আমার আদরের ছেলে, আল্লাহ্র বান্দা তার আমলে এর চাইতে দশ গুন বেশী প্রচার এবং প্রসার করবে ইন্শাআল্লাহ্। বাপকা বেটা সিপাই কা ঘোড়া। ছেলে শক্তিশালী হলেই পিতা শক্তিশালী হয়। আমার এ ছেলে আল্লাহ্র বান্দা দুনিয়াতে আসার পূর্বে আমি চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্পাকের নিকট দোয়া করেছিলাম মাবুদ আমাকে একটি ছেলে সন্তান দেন আমি এই সন্তানকে ইসলামের কাজের জন্য নিয়োজিত করবো, আল্লাহ্পাক আমার এ দোয়া কবুল করেছেন" (আলহামদুলিল্লাহ্)। যেই মহান আল্লাহ্র ওলী চোখের পলকে একজন জাহান্নামী মানুষকে আল্লাহ্র ওলী বানাতে পারতেন সেই মোর্শেদ কেবলা চোখের পানি ঝরিয়ে যাকে দুনিয়াতে এনেছেন সেই মানুষটি কেমন হতে পারে জ্ঞানী মানুষ খুব সহজেই তা বুঝাতে পারেন। আমরা সবাই যেন এই মহানেয়ামতের সঠিক কদর করতে পারি। উল্লেখ্য যে, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের সকল ভক্তবৃন্দ ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ, কারণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের পীর সাহেব হুজুর, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বে অন্যতম। পাক-ভারত উপমহাদেশে এত উচ্চ শিক্ষিত পীর নেই বললেই চলে। একজন খাঁটি আল্লাহ্র ওলি, জাইয়েদ আলেম ও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সহ্বতে এসে মহান আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে সকলে আমন্ত্রিত।

গবেষণা ও কিতাবসমূহ

যখন বিজ্ঞান চর্চার উপর না-জায়েযের ফতোয়া ছিল, চশমা ব্যবহারটাকেও জায়েয হবে না বলে মনে করা হতো, গোড়া আলেম ও ভন্ড পীরদের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছিল, ঠিক সে সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস গবেষণা করে যুগান্তকারী বিজ্ঞানভিত্তিক মহা কিতাবসমূহের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামী বিদূরিত করেছিলেন। সেই মহা কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

সমাজের নর-নারীকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ও চরিত্রবান আদর্শ নর-নারীর সুশৃংখল জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসাবে কোরআন শরীফ ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে ১৯৭৪ সালে সমাজকে উপহার দিলেন "বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা" নামক মহাগ্রন্থটি এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন পর্দা শুধু ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য অপরিসীম

কল্যাণ বয়ে আনে। যার ফলে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছে। এমনকি এই কিতাব পড়ে অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত পর্দা (বোরখা পরে) করা শুরু করেছে।

তারানায়ে জান্নাত

তিনি ১৯৮১ সালে "তারানায়ে জান্নাত" বা বেহেশ্তী সূর নামক অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব প্রকাশ করে মহাকবির পরিচয় দিয়েছেন। যা সালেককে আল্লাহ্পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। তারানায়ে জান্নাত স্মরণ করিয়ে দেয়, ৯৯৯ সালের দিকে "মহাকাব্য শাহনামার" লেখক মহাকবি ফেরদৌস সাহেব, আনুমানিক ১২০৫ সালের "গুলিস্তার" লেখক আল্লামা শেখ সা'দী সাহেব (রহঃ) এবং ১২৩৭ সালে "মসনবী শরীফের" লেখক মহাকবি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী সাহেব (রহঃ)-র মত মুসলিম মহাকবিদের অমর কীর্তির কথা।

মহাস্বপ্ন

হুজুরপাক (সাঃ) এর পর সুদীর্ঘ প্রায় ১৫ শত বছর পর তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহাস্বপ্ন" নামক কিতাবে একটি হাদিস শরীফের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ্য দশ বছর নিরলস গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৮৬ সালে বিজ্ঞানকে উপহার দিলেন 'মহাস্বপ্ন' নামক বিজ্ঞানভিত্তিক মহাকিতাব। যা ইতিহাসে ইসলামের নাম উজ্জ্বল করে রাখবে।

এই কিতাবে তিনি বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing, and one man divided into crore of crores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings)। "মৃত্যুর পর মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায় না, একটি মানুষ কোটি কোটি **পরমাণু-মানুষে** রূপান্তরিত হয় এবং তারা অনুভূতি নিয়েই দেখতে ও শুনতে পায়" আবিষ্কার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন ইসলামের মহা মনীষীদের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত। এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন ৭৬৮ সালে রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান সাহেবের কথা, যার লিখিত "আল-কিমিয়া" নামক মহাকিতাব থেকে পরবর্তীতে রসায়নের (Chemistry) জন্ম, তিনিই প্রথম সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন। আল-বাত্তানী সেই ৮৯০ সালেই ত্রিকোণমিতির সাইন (SinA), কোসাইনের (CosA) সাথে ট্যানজেন্টের (TanA) সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড = এক সৌর বছর প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, এবং টলেমীর বহু থিওরী সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। আনুমানিক ১০১৫ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আবু আলী ইবনে সিনায় লিখিত মহা-কিতাব "আল কানুন ফি আল টিব্ব" (যা ছিল ১৭৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্য বই) এর ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ বিজয়ের কথা। একজন নবীন বিজ্ঞানী ও গবেষক "মহাস্বপ্ন" নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন "মহাস্বপ্ন" নামক মহাকিতাবটি প্রায় ৫০০ বছরের ভিতরে অন্যতম মুসলিম মহাবিজ্ঞানীর আবিষ্কার যা বিজ্ঞানের মত ধারাকে পরিবর্তন করবে। উল্লেখ্য ১৯৮৭ সালে এই মহাবিজ্ঞানী মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "মানুষের আঙ্গুলের একটু অংশ কেটে ফেললে ঐ কাটা অংশ থেকে অসংখ্য মানুষ তৈরী করা সম্ভব"- যা পরবর্তীতে ক্লোন থিওরীর রূপ নিল এবং ডলি নামক ভেড়া তৈরী করা হল। মানুষ তৈরীর গবেষণা চলছে। "মহাস্বপ্ন" সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমার মহাস্বপ্ন নামক চটি বইখানা যদি ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে কয়েকটি ৫ টনি ট্রাক ভরা কিতাব হবে।

জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব (A Philosophy of Physiology)

১৯৮৮ সালে তিনি "জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব" (A Philosophy of Physiology) নামক কিতাবের মাধ্যমে জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং আল্লাহ্র পথে এসেছে।

মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব

১৯৮৯ সালে "মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব" নামক মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তথ্য ও দিক নির্দেশনা সম্বলিত কিতাব লিখেন, যা চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার সালেকদের পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মহা ভাবনা (A Philosophy of Astronomy)

মহান আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে একমাত্র তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহা-ভাবনা" (A Philosophy of Astronomy) নামক মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যা বিশ্বের নাস্তিকদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এ কিতাবটিতে। এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। উল্লেখ্য তিনি ১৯৯৯ সালের ১৩ই মার্চ সমগ্র বিশ্বের প্রায় ২০০ ডক্টরেট ও মুসলিম দার্শনিকগণের মাধ্যমে যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী সাহেব কর্তৃক স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ডাঃ হারুন-অর-রশিদ সাহেবের (লেকচারার, ডি.এম.সি) মতে বর্তমান বিশ্বে

Modern Astronomy বলতে যদি কিছু থাকে তার নাম হচ্ছে "মহা-ভাবনা"।

ধূম পিপাসা সর্বনাশা

১৯৮৯ সালে "ধূম পিপাসা সর্বনাশা" কিতাবের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন কি উপায়ে ধুমপান করলে কোন ক্ষতি হয় না এবং কিভাবে ধুমপান ত্যাগ করা যায় তার একটি অব্যর্থ উপায় বলা হয়েছে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

পীর ধরার অকাট্য দলিল

"পীর ধরার অকাট্য দলিল" লিখে প্রমাণ করলেন আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্য পেতে হলে একজন খাঁটি পীর অবশ্যই ধরতে হবে। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করেছেন।

কয়েকটি কারামত

আল্লাহ্পাকের বড় বড় ওলীদের (কুতুব-উল-আকতাব) জীবনে মহান আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তেমনি কিছু সংখ্যক অলৌকিক ঘটনা বা কারামত এখানে প্রকাশ করা হল।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিচারপতি মোঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে হাফেজ্জী হুজুরের খলিফা অধ্যাপক জনাব সামসুল আলম সাহেব, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর লিখা "কাসদুল সাবিল" নামক এলমে মা'রেফতের একটি কিতাব পড়তে দিয়েছিলেন। বিচারপতি সাহেবের ভাষায়- "কাসদুল সাবিল" কিতাবখানা পড়া অবস্থায় আমি একদিন মানিকগঞ্জের হুজুর কেবলার সহিত জামাতে আসর নামাজ পড়ার জন্য মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাই। আসরের নামাজ পড়ার পর আমি মোর্শেদ কেবলাকে সালাম প্রদান করি- 'আস্সালাম আলাইকুম'। সালামের জবাব দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, "আসর নামাজের পূর্বে, আমার এখানে আসার সময় আপনি 'কাসদুল সাবিল' কিতাবখানা পড়ে এসেছেন।" আমি বললাম, "জ্বী হুজুর" এবং তাঁর 'এলমে কাশ্ফ' সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলাম।

* স্থান বয়রাঃ মোর্শেদ কেবলা মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বয়রা গ্রামে আব্দুল হালিম নামে একজন মুরিদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি তখন নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন "মাটির নীচ দিয়ে তো ইলিশ মাছের ঝাঁক দেখা যায়"। ঐ মুরিদ তখন কিছু বুঝতে পারলো না, বুঝার কথাও না। আল্লাহ্র ওলীদের কথা বুঝাটাও একটা কারামত। বয়রা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে পদ্মা নদী ছিল। কিছু দিনের মধ্যে এই সাড়ে পাঁচ মাইল জায়গা ভেঙ্গে ঐ মুরিদের বাড়ী সহ নদী হয়ে গেল। এখন সেই জায়গায় ইলিশ মাছের ঝাক দেখা যায়। জেলেরা অধিক সংখ্যক ইলিশ মাছ ধরার জন্য সেখানে যায়।

* স্থান ঃ সাটুরিয়া নন্দেশীতে - মোর্শেদ কেবলা একদিন আসরের নামাজ আদায় করতে দেরি হয়েছিল অর্থাৎ নামাজের সময় প্রায় শেষের দিকে। তখন সাথে কয়েকজন মুরিদ ছিল তাদেরকে তিনি বললেন "মসজিদের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেও আমি নামাজ আদায় করি"। মসজিদের ভিতরে মোর্শেদ কেবলা একাই নামাজ আদায় করছিলেন। দরজা জানালা বন্ধ করে মুরিদরা বাইরে বসা ছিল, একটু পরে আব্দুল কাদের মোল্লা (মোর্শেদ কেবলার খাদেম) ভাই ভাবলেন কোন জানালা খোলা আছে নাকি দেখে আসি, তিনি মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখেন মোর্শেদ কেবলার জায়নামাজ মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে আছে এবং মোর্শেদ কেবলা শূন্যের উপরে নামাজ আদায় করছেন (আলহামদুল্লিল্লাহ্)। — চোখে দেখা সাক্ষী মোল্লা ভাই ও কয়েকজন মাওলানা সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* স্থান ঃ গোলাকান্দা – মোর্শেদ কেবলা রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সাথে মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত নামে দুই জন মুরিদ ছিলেন। তারাও ঘুমালেন। গভীর রাতে মাওলানা লাহরী সাহেব উঠে দেখলেন মোর্শেদ কেবলা বিছানায় নাই তখন তিনি ভাবলেন মোর্শেদ কেবলা কি এস্তেঞ্জায় গেলেন, ভাল করে খুঁজে দেখলেন নেই। মসজিদেও নেই। এদিক ওদিক খুঁজতে গিয়ে মাওলানা লাহরী ও শওকত সাহেব দেখলেন পশ্চিম পাশে পুকুরের মাঝখানে আকাশের উপর থেকে একটি উজ্জ্বল আলো এসে পরছে সেই আলোর মাঝখানে মোর্শেদ কেবলা জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন! (আলহামদুলিল্লাহ্)। কিছুক্ষণ পর জায়নামাজ সহ মোর্শেদ কেবলা পানির উপর দিয়ে ভেসে পুকুরের কিনারের দিকে আসতে লাগলেন, উপর থেকে আলোটাও আসছিল। তখন মুরিদ দুইজন ভাবলেন মোর্শেদ কেবলা যদি তাদেরকে দেখে রাগ করেন, এই ভেবে দুইজন এসে ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ্র ওলী বুঝতে পেরেছিলেন এরা দুইজন দেখে ফেলেছে, ঘরে এসে দুইজনকে বললেন "যা দেখেছো আমি জীবিত থাকা অবস্থায় কখনও কারো কাছে বলবে না"। –চোখে দেখা সাক্ষী মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* ১৯৯৪ সালে উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেব হজ্ব করতে যাবেন, তখন তিনি কুতুব-উল-আকতাব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের (রহঃ) নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন। মোর্শেদ কেবলা

প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন “মদীনা মনোয়ারায় মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের সময় আমার সালাম ও দরূদ শরীফ দয়াল নবীজীকে (সাঃ) পৌঁছায়ে দিয়েন।'' প্রিন্সিপাল সাহেব হজ্জ্ব করতে গেলেন, তিনি হুজুর (সাঃ) এর রওজা শরীফে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা সালাম পাঠিয়েছিল একে একে সবার নাম বলে সালাম দিচ্ছিলেন যেই মাত্র প্রিন্সিপাল সাহেব দয়াল মোর্শেদ কেবলার নাম বলে সালাম দিলেন সাথে সাথে হুজুরপাক (সাঃ) এর রওজা শরীফ থেকে সালামের জবাব আসল “ওয়াকুল্লাহু মিননি সালাম'' অর্থাৎ আমার সালামও তাঁহার নিকট পৌছায়ে দিও'' (সুবহানআল্লাহ্)। এ তরীকার ইমাম কুতুব-উল-আকতাব গরীব-ই-নেওয়াজ হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) এর মত মানিকগঞ্জ পীর সাহেব হুজুর, দয়াল নবীজীর (সাঃ) পক্ষ থেকে সালামের জবাব পেলেন। —নিজ কানে শোনা ও চোখে দেখা সাক্ষী আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়ালে

হুজুরপাক (সাঃ) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন তার কিছুদিন পূর্বে তাঁর আদরের নাতীদ্বয় হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) একই রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে পরেছিলেন। তখন তাদের সকল কাজের উৎস, প্রাণাধিক প্রিয় নানাজানের (সাঃ) নিকট এসে দুই ভাই বললেন, “নানাজান আমরা দুইভাই গতকাল রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি''। হুজুরপাক (সাঃ) বললেন নানাভাই কি দেখেছ আমাকে বল, তখন বড় ভাই ইমাম হাসান (রাঃ) বললেন “আমি দেখলাম আমাদের চারিদিকে খুব বিপদ, প্রচন্ড ঝড় হচ্ছে, কোথাও আশ্রয় পাচ্ছি না, দুই ভাই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি, এমন সময় একটি বড় গাছ দেখে দুই ভাই ঐ গাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেই, একটু পরে হঠাৎ জোরে বাতাস এসে গাছটিকে ভেঙ্গে নিয়ে যায়।'' তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কনিষ্ঠ নাতী ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে বললেন “নানাভাই তুমি কি দেখেছ বল?” তিনি বললেন “নানাজান আমি হুবহু একই স্বপ্ন দেখেছি''। তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কলিজার টুকরা দুইভাইকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললেন “ভাইদ্বয় খুব শিঘ্রই তোমরা তোমাদের নানাভাইকে হারাবে, তোমাদের নানাভাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে'' এ কথা শুনে শিশু ভাইদ্বয় (রাঃ) গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তাই দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথা সর্বপ্রথম নাতী ভাইকে বলাটাও সুন্নত। হুজুরপাক (সাঃ) এর খাঁটি ওয়ারিস দয়াল মোর্শেদ কেবলা দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথাটি বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে সুন্নতস্বরূপ তাঁর আদরের নাতী- নাতনী ভাইদেরকে বলেছিলেন। তিনি সারা জীবন অজস্র পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ৬৭ বছর বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। **সেদিন ছিল ২০০০ সালের ২১ শে মে রবিবার দিবাগত রাত্রি অর্থাৎ সোমবার,** মোর্শেদ কেবলা কন্যাদেরকে বললেন আমাকে ভাল করে গোসল করিয়ে দাও। সবাই তাঁকে গোসল করিয়ে দিলেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুব অল্প আহার করতেন। কিন্তু সেদিন বললেন, “আমাকে খাবার দাও আমি আজকে খাব”। তিনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেন, তারপর এস্তেঞ্জা সেরে ওজু করে বিছানায় শুতেই শরীর খুব খারাপ লাগছিল। বিছানায় শুয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে “পাছ আন ফাছ” সবক (নিঃশ্বাস নিতে আল্লাহ্- ছাড়তে হু) করছিলেন। কিছুক্ষণ সবক করতে করতে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের নয়নমনি, কুতুব-উল-আকতাব, অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হুজুরপাক (সাঃ) এর এই খাঁটি ওয়ারিস সকলের বুক খালি করে দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়াল হয়ে গেলেন।

মোর্শেদ কেবলার মহা-মূল্যবান কয়েকটি বাণী

- জীবনের প্রথম শাখে যে কোকিল প্রথম ডাকে, হোক সে কুৎসিত কালো, তবু জীবনের আলো।
- প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কথা বলেছেন, যুদ্ধের সময় কোন কথা বলতেন, হযরত আলী (রাঃ)-কে ঘাড়ে করে পানি আনতে বলেছেন। সব কথা আজও বাতাসে ভেসে বেড়ায়।
- হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন “বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাত্র ৭০ হাজার খাঁটি ঈমানদার থাকবে” তুমি বসে বসে ভাব তুমি এ পরীক্ষায় টেকো কিনা।
- বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে কলেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্''-র ধ্বনীতে প্রতিধ্বনীত হবে।
- একটি কথা তিনি, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের সামনে প্রায়ই বলতেন তা'হলো “আমাকে যদি কেউ কখনো পান খাওয়ার সময় ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে চুন খেতে দেখেন এবং কোন সুন্নত এমনকি একটি মোস্তাহাবেরও খেলাপ করতে দেখেন, তাহলে আমার মুরিদ হয়ে যদি আমাকে সংশোধন করে না দেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত ঠেকা (দাবি) থাকবেন।
- মূর্খ্য লোকের ঈমান কচু পাতার পানি।
- উঠ, জাগ, অভিষ্ঠ সিদ্ধির আগে ক্ষান্ত হইও না।
- আমার একটা অনুরোধ, হাদীস শরীফে যা আছে যেমন আছে এবং কোরআন শরীফে যা আছে যেমন আছে তেমনভাবেই জীবন চালাতে হবে। এর বাইরে আমার ধারে (নিকট) যে বয়াত (মুরিদ) হইয়া থাকেন কোন বুদ্ধি খাটাইতে পারবেন না, যদি খাটান আমি তার পীর না, সে আমার মুরিদ না।

- মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ক্রমাগতভাবে এমন উন্নতি করছে যে, এরপর মানুষ আর মানুষ থাকবে না, খালি জ্ঞানই হবে। যদি কেউ হেটে যায় মানুষ বলবে একটা জ্ঞান হেটে যায়, এত জ্ঞানী মানুষ হবে এরকম হতে হতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করবে (নাউজুবিল্লাহ্), করতে করতে আবার খুব যদি জ্ঞানী হয় তখন সে ফিরে আবার আল্লাহ্পাকের কুদরতী পায়ে পরে কান্দা শুরু করবে (আলহামদুলিল্লাহ্)।
- কোন শব্দ শুরু হলে সেটা কোথাও যেয়ে শেষ হয় না, যেতেই থাকে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেয়েও শেষ হয় না, এভাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায়, যেতে যেতে আল্লাহ্পাক পর্যন্ত যায়।
- ঘর যেমন মানুষকে আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, মানুষের মনের ঘরও তাকে আল্লাহ্ থেকে (অনন্ত থেকে) বিচ্ছিন্ন করে রাখে।
- তুমি দেখিতেছ পাহাড়গুলি স্থির হইয়া রহিয়াছে। অথচ উহা মেঘের ন্যায় চলাফেরা করিতেছে।
- বান্দার চোখের পানির সঙ্গে এবং জেকেরের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের একটা দারুন রকমের সম্পর্ক আছে।
- তোমার দুর্বল ঈমানের সঙ্গে একটা সবল ঈমানের যোগ কর।
- একটা মানুষের কাছে না গেলে মানুষ মানুষ হয়না।
- এলেমের যখন মৃত্যু হয়, আলেম তখন আলেম হয়।
- জগৎ জোড়া একই মোর্শেদ চিনে কয়জনা, মোর্শেদের মরণ হয় না কোন কালে।
- দেখলে তাঁরে দেখার মত, সাধনা কি লাগত এত? ভাবলে তাঁরে ভাবার মত, ভাবনা রইত না আর।

বিঃ দ্রঃ এখানে খুব সংক্ষেপে এ মহান আল্লাহ্র অলীর পরিচিতি প্রকাশ করা হলো। সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মোর্শেদ কেবলার সম্পূর্ন জীবনী বের হতে যাচ্ছে।

জীবনের গোপন কথা

এই মুহূর্তে আপনি কেমন করে বসে আছেন, কেমন করে এই বইখানি পড়ছেন, কথা বলছেন, তা নির্ভর করে একটা আশ্চর্য যন্ত্রের উপরে। সেটা স্পন্দিত না হলে, চোখের পলকে আপনি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবেন। এই অবাক করা দুরূহ যন্ত্রটির নাম হচ্ছে হৃৎপিন্ড। তাই এই যন্ত্রাটি সম্বন্ধেই প্রথমে কিছু আলোচনা করা দরকার।

মানবদেহের বক্ষস্থলের বামদিকে মধ্যচ্ছদার (Diaphragm)–এর উপরে হৃৎপিন্ডটি অবস্থিত। দেখতে অবিকল একটি বট পাতার মত। গোড়া প্রশস্ত মাথাটা চিকন ছোঁচালো। হৃৎপিন্ডটা মাঝামাঝি দু'টো ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক ভাগে আবার দু'টো করে ভাগ। ডানদিকের খন্ডে ওপরে একটি নীচে একটি। অনুরূপভাবে বামদিকের খণ্ডে ওপরে একটি নীচে একটি ভাগ রয়েছে। ডানদিকের ওপরের ভাগের নাম ডান অলিন্দ (Right Atrium), নীচের ভাগের নাম ডান নিলয় (Right Ventricle)। অনুরূপভাবে, হৃৎপিন্ডের বাম অংশের ওপরের অংশের নাম বাম অলিন্দ (Left Atrium) এবং নীচের অংশের নাম বাম নিলয় (Left Ventricle)। হৃৎপিন্ডের দু'পাশে ওপর থেকে নীচে ঝুলে রয়েছে দু'টো লাউয়ের মত জিনিষ। এদেরকে ফুসফুস বা ছাকনি (Lungs) বলা হয়েছে। এরা নিঃশ্বাসের ভেতর থেকে অক্সিজেন নামক একপ্রকার জিনিস ছেঁকে রক্তে মিশিয়ে হৃৎপিন্ডে পাঠিয়ে দেয়, তার ওপরেই আমাদের জীবন নির্ভর করে।

মানবদেহে অজস্র রক্তবাহী নালী আছে, যাদের ভিতর দিয়ে দেহে রক্ত চলাচল করে দেহকে সর্বদা জীবন্ত রাখে। এই নালীগুলো দু'রকমের। একটির নাম শিরা যা দেহের আবর্জনাময় রক্ত হৃৎপিন্ডে নিয়ে যায় শোধনের জন্য। অন্যটির নাম ধমনি যা দিয়ে শোধিত রক্ত সারাদেহে প্লাবিত হয়ে পড়ে।

অদ্ভুত উপায়ে হৃৎপিন্ড কাজ করে চলে। হৃৎপিন্ডটা একটা গোস্তের পিন্ড। দেহের শিরাগুলো অশোধিত রক্ত বহন করে প্রথমে হৃৎপিন্ডে ডানভাগের ওপরের অংশে নিয়ে যায়, যাকে ডান অলিন্দ বলে, রক্ত যখন ঢোকে তখন ডান অলিন্দের গোস্তগুলো প্রসারিত হয়ে রক্তটা গ্রহণ করে পরে রক্তকে সে সংকুচিত করে ডান নিলয়ে ঠেলে দেয়। এর মাঝখানে একটা ব্যাপার ঘটে। ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যে একটি কপাটিকা রয়েছে অর্থাৎ দরজার মত। সেটি ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতই কিন্তু নীচের দিকে খোলা। ডান অলিন্দ যখন সংকুচিত হয়ে রক্তকে ডান নিলয়ে পাঠাতে শুরু করে, রক্ত

তখন এই কপাটিকা বা দরজাটি (Mitral Valve) দিয়ে অতিক্রম করে। রক্তে ডান নিলয় ভরে যায় তখন এই কপাটিকা বা দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়। ডান নিলয় থেকে এই রক্ত একটা নালী দিয়ে সরাসরি হৃৎপিন্ডের দু'দিকে দু'টো ফুসফুসে ঢুকে। ওদিকে ফুসফুস নিঃশ্বাস থেকে যে অক্সিজেন সংগ্রহ করে রেখেছে, রক্ত তার ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দু'দিকের দু'টো ফুসফুসই রক্তের সঙ্গে অক্সিজেন মিশিয়ে রক্তকে শোধিত করে দেয়। তারপর এই শোধিত রক্ত আবার ফুসফুসের সংযোজিত নালী দিয়ে হৃৎপিন্ডের বাম অংশের উপরিভাগে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। বাম অলিন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেই রক্ত বাম নিলয়ে প্রেরণ করে। এখানেও অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে একটা দরজা আছে। হৃৎপিন্ডের ডানদিকে যা যা হয়, বাম অংশেও তাই হয়। বাম অলিন্দ থেকে রক্ত যখন বাম নিলয়ে যায়, তখন বাম নিলয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হয়। রক্ত যখন তার ভিতরে ঢোকে সে প্রসারিত হয় এবং পরে সংকুচিত হয়ে যায়। সংকুচিত হবার সময় সে রক্তকে এমন জোরে একটা ধাক্কা দেয় যে রক্তটা এক মিনিটের ভিতরে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে– এমনকি চুলের গোড়া, চোখের মনি, হাত ও পায়ের আংগুলের মাথায় পর্যন্ত সঞ্চালিত করে দেয়।

ভাববার কথা

হৃৎপিন্ডের প্রতিটি অংশ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয়ে দেহে রক্ত চলাচল অব্যাহত রেখেছে। প্রতি মিনিটে এই স্পন্দনের সংখ্যা হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ বার। এ হ'ল স্বাভাবিক স্পন্দন। এভাবে দৈনিক হৃৎপিন্ডটা প্রায় এক লক্ষ বার স্পন্দিত হয়। অর্থাৎ সংকুচিত হয় ও সম্প্রসারিত হয়। বিজ্ঞানীরা অনেক ভাবনা চিন্তা করে, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন হৃৎপিন্ডের এই রহস্যময় স্পন্দনের কারণ আমরা খুঁজে বের করতে পারলাম না এবং স্বীকার করে বলেছেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করে যা আমাদের বোধগম্য নহে। অনেকে বলে এবং বিশ্বাসও করে স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। সবই এমনিতে হয়– এসব যারা ভাবে এবং বলে তারা কিন্তু এসব দেহতত্ত্ববিদ মহাবিজ্ঞানীদের ছাত্র হবার মত জ্ঞানও রাখে না। অথবা বিশেষ একটা বিষয়ে কিছু জেনে-টেনে এক আধটা পাশ-টাশ করেছে। মহাবিজ্ঞানী এবং মহাজ্ঞানী আইনষ্টাইনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, স্রষ্টা বলতে কি কোন মহাশক্তি আছেন? তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই আছেন কিন্তু তার সম্বন্ধে তোমরা কিছু অনুধাবন করতে পারবে না।

আরেকটি ভাববার কথা, হৃৎপিন্ডটা কেন চলমান থাকে এবং তার এই শক্তি প্রথমে কোথা থেকে এল। **যারা শুধু বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে আর যুক্তি ছাড়া কিছুই মানে না তারা যুক্তিতে আটকা পড়লেও যুক্তিকেও যুক্তিহীন বলে মনে করে। এটা একটা একগুয়েমি স্বভাব এবং যা জ্ঞানের অলক্ষ্যে জ্ঞানকে ফাঁকি দেবার একমাত্র ধারাল অস্ত্র।** বিশ্ববিশ্রুত মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানী নিউটন আইন প্রকাশ করলেন, সে আইন সারা বিশ্ব

চোখ বন্ধ করে মেনে নিল। তিনি বললেন, জড় পদার্থে গতি সৃষ্টি না করে দিলে সে গতি সম্পন্ন হয় না এবং যতক্ষণ গতি সৃষ্টির কারণ থাকে ততক্ষণই এ জড় পদার্থ গতি সম্পন্ন থাকে। এ হচ্ছে নিউটনের দেয়া আইন (Law of Newton)। হৃৎপিন্ড একটা মাংস খন্ড অর্থাৎ জড় পদার্থ। হৃৎপিন্ডটা সৃষ্টি হবার পর নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিল গতিহীনভাবে। এতে কোন স্পন্দন ছিল না, কোন সংকোচন বা সম্প্রসারণ ছিলনা। ডান বা বাম অলিন্দ এবং নিলয়গুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ এক সময় এরা নড়ে উঠল, স্পন্দিত হতে লাগল এবং হৃদক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। জড় পদার্থকে চালিয়ে না দিলে চলে না, গতি সৃষ্টি করে না দিলে গতি সম্পন্ন হয়না– বিজ্ঞানীর এ আইনে বিশ্বাসী যুক্তিবাদীরা, নাস্তিকরাও এ আইন মেনে নেয়। এই হৃৎপিন্ডটি মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত জীবন্ত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখছে। সর্বাঙ্গ–এমনকি তার যুক্তি করার ক্ষমতাও যে যুগিয়ে দিচ্ছে– **এই হৃৎপিন্ডটা প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ছিল, ছিল গতিহীন, স্পন্দনহীন, স্থবির। এটাকে প্রথম একটা ধাক্কা দিয়ে কে এতে গতি সৃষ্টি করে দিল?** বিজ্ঞানীরা বলেন, এটা আমরা জানিনে, এটা আমাদের বোধগম্য হয় না। হৃৎপিন্ড কেন যে এমন করে নড়াচড়া করে, এর কারণ কেউ আজও খুঁজে বের করতে পারেনি।

হৃৎপিন্ডের এই স্পন্দনের একটা কারণ খুঁজে পেতে গিয়ে আরও হতবাক হয়ে তারা মহাস্রষ্টাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছে ভ্যাগাস (vagus) নার্ভ নামে একটা নালী মাথার নিম্নভাগ থেকে নেমে মধ্যচ্ছদা পর্যন্ত এসে মিশেছে। এটা হৃৎপিন্ডে গিয়ে মিশেছে। ভ্যাগাস কথার মানে ভবঘুরে (Vagabond)। তড়িতের মত প্রবাহ এর ভিতর দিয়ে এসে হৃৎপিন্ডে অনবরত প্রেরণা (Impulse) দেয়, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিন্ড সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা শত চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারেনি এই প্রেরণা কোথা থেকে আসে এবং মস্তিষ্কের কোথায় এই প্রেরণা সৃষ্টিকারী মেশিন (Generating machine)। বিজ্ঞান বলে, প্রতিটি শক্তি (Energy) সৃষ্টির এক সৃষ্টিকারী মেশিন (Generating machine) আছে, যা থেকে শক্তির উৎস আসে। যেমন কাপ্তাই-এর সৃষ্টিকারী মেশিন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে আসে, ডায়নামা থেকে শক্তি আসে। বিজ্ঞানীরা মাথা নত করে বলেছেন, ভ্যাগাস নার্ভের প্রেরণার উৎস-শক্তির উৎস কোথায় তা নিশ্চয়ই অজানা এক শক্তির হাতে এবং এই শক্তিই হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন।

এমনি ভাবে দেহতত্ত্ববিদগণ মানব দেহ জরীপ করতে গিয়ে অসংখ্য স্থানে মহাস্রষ্টা আল্লাহকে মেনে নিয়েছেন। যিনি হৃৎপিন্ডে স্পন্দন দিয়েছেন, যিনি প্রথম ধাক্কা দিয়ে হৃৎপিন্ডতে ষ্টার্ট করিয়ে দিয়েছেন এবং যিনি ভ্যাগাস নার্ভে জীবন প্রবাহের প্রেরণা (Impulse) ইনজেক্ট করে দিচ্ছেন, তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে জানিয়ে দিয়েছেন, **"আল্লাহু নুরুস্সামাওয়াতে ওয়াল আরদ"** (আল-কু'রআন) অর্থাৎ আসমান জমিনে যা কিছু

প্রেরণা পায়, শক্তি পায়, হৃৎপিন্ড তার চলশক্তি পায়, ভ্যাগাস নার্ভ প্রবাহ পায়, জীবকোষ তার শক্তি পায়– এসবের জেনারেটর হচ্ছি আমি, আমি মহাআলো, মহাতেজময় শক্তি। আমার মহাশক্তির মেশিন থেকে সবাই শক্তি (Energy) পায়। আমার আলো বিদ্যুতের প্রবাহের মত মস্তিষ্কে খেলে যায় অনবরত, তা থেকে ভ্যাগাস নার্ভ প্রবাহ পায়। সেই তড়িৎ প্রবাহ প্রতিনিয়ত হৃৎপিন্ডকে উজ্জীবিত করে এবং তার স্পন্দন শক্তি যোগায়। এ জন্য প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্ অনুধাবন করে দেখতে বলেছেন, **"আফালা তা'কেলুন"**, অর্থাৎ তোমাদের কি জ্ঞান নেই? তোমরা কি একেবারেই পাথরের চেয়ে স্থবির হয়ে চিন্তা কর? তোমাদের সামনে এক খন্ড গোশ্‌ত খাবারের পেয়ালায় রাখা হল, এখন তুমি ওতে হাত দিতে যাবে এমন সময় যদি ঐ মাংসপিন্ডটি হঠাৎ স্পন্দিত হয়ে সংকুচিত এবং সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং তার ভিতর থেকে ঝোলগুলো উথলিয়ে ওঠে এবং উঠানামা করতে থাকে প্রতি মিনিটে ৮০ বার, তবে তুমি নিশ্চয়ই লাফ দিয়ে উঠবে, ভাবনায় বিভোর হয়ে চিল্লাচিল্লি করে বিবিকে, পড়শীকে হাকাহাকি করে ডাকতে শুরু করবে। কিন্তু **তোমার ভিতরে মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার তোমার নিজের গোশতখন্ডটা লাফাচ্ছে, তার শব্দও তুমি ষ্টেথিসকোপে কানে শুনতে পাও, কই তুমি তো জীবনে কোনদিন এর জন্য তোমার কোন জ্ঞানী পড়শীকে ডেকে এর কারণটা জিজ্ঞেস করলে না বা ভুলেও একদিন একটু চিন্তা করে দেখলে না**। এই মর্মে আল্লাহ্ বলে, **"উলায়িকা কাল আনয়াম বালহুম আদাল"** (আল-কু'রআন) অর্থাৎ এত নিকটের চিন্তা ভাবনা যার নেই, ভিতরের খবর নেই, বাইরের কত কিছু নিয়ে কতই না ভাবনা ভাবে, এরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

এক লাইনের জ্ঞান খাটিয়ে অন্য লাইনের সমস্যার সমাধান করা যায় না। এক যন্ত্রে সকল অস্ত্র তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। কৃষিবিদ্যার একজন ডক্টর একটা ব্যাধির যেমন প্রেসক্রিপশান করতে পারে না, ঠিক একজন ডাক্তার কেমিষ্ট্রির সূক্ষ্ম থিওরি নাও বুঝতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে ঐ ক্ষেত্রে যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে গিয়েই শিখতে হয়। হৃৎপিন্ডে কেমন করে প্রবাহ আসে এবং কেন স্পন্দিত হয় এবং কে এই স্পন্দন ঘটায় তার সম্বন্ধে শুধু দেহতত্ত্ব (Physiology) এবং শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় (Anatomy) পারদর্শী হয়ে বোঝা যাবে না। এখানে আরও সূক্ষ্ম জ্ঞানের দরকার হবে এবং এ লাইনে যারা বিশেষজ্ঞ (Specialist) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানা যাবে হৃৎপিন্ড কেন এ রকম করে। স্থুল জ্ঞান দিয়ে অনেক সূক্ষ্ম জিনিষ বোঝা যায় না। তাইতো কবির ভাষায় বলতে হয়–

হাতুড়ি দিয়ে সেলায়ের কাজ সম্ভব না ভবে,
যার কাছে যে খবর আছে সেথায় যেতে হবে।

মানুষকে যে মানুষ করে চালায় সর্বক্ষণ,
তার নিকটে জীবনে কি বসেছো কিছুক্ষণ?
তুমি যারে কল্পনা কও গল্প নাতো তা,
জল্পনা সব ছেড়ে দিয়ে নোয়াতে পার মাথা?
বিশ্বাসেরে অবিশ্বাসে রাখলে আড়াল করে,
সত্যি যদি সত্য হয়ে স্রষ্টা তোমায় ধরে।

হৃৎপিন্ড কেন স্পন্দিত হয়, কোথা থেকে শক্তি পায় এবং কে সারা দেহে রক্ত চলাচল প্রবাহমান রাখে? ভ্যাগাস নার্ভের শক্তির উৎস কোথায় ও জীবকোষ কেন বিভক্ত হয়? প্রথম কোষে জীবন ধারা কিভাবে শুরু হয়, এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা না বলে পারা যায় না। হযরত মুসা (আঃ) কে কালিমুল্লাহ্ বলা হত, অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অনেক সময় যুক্তি করতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি আল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করলেন, আপনি সর্বদাই কি মানুষের সঙ্গে থাকেন? আল্লাহ্ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ সর্বদাই আমার প্রভাব মানুষের ওপরে পড়ে আছে। মুসা (আঃ) আরজ করলেন, হে, মাবুদ, আমি যখন আমার বিবির সন্নিকটবর্তী হই তখনও কি আপনি আমার বিবির সঙ্গে থাকেন? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ তখনও থাকি। হযরত মুসা (আঃ) লজ্জিত হয়ে বললেন, তাহলে এটাতো বড় শরমের কথা হল, আমি বিবির সাথে যখন মিলি আপনি মেহেরবানী করে তখন তার সাথে থাকবেন না। আল্লাহ্ স্বীকার করে বললেন, তাই-ই হবে। কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। একদিন হযরত মুসা (আঃ) তাঁর বিবির সঙ্গে বসে আলাপ করতে করতে এক সময় মিলনের অভিপ্রায়ে তার হাতখানি ধরে ফেলল, অমনি এক আজব ঘটনা ঘটে গেল। মুসা (আঃ) বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে পাষাণ পাথরের মত নিশ্চল ঠান্ডা হয়ে গেল, সর্ব শরীর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। তিনি স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিলেন। আর অমনি চোখের পলকে তাঁর স্ত্রী আগের মত স্বাভাবিক হয়ে গেল। আবার মুসা (আঃ) তার হাত ধরলেন, আবারও তাঁর স্ত্রী আগের মত কঠিন পাথর হয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার এই কান্ডের পরে মুসা (আঃ) হতবাক হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করে বললেন, মাবুদ কেন এমন হয়? তখন আল্লাহ্ উত্তর দিলেন, মুসা তোমার কি স্মরণ নেই? তুমিই না আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলে, যখন বিবির সঙ্গে মিলবে তখন আমি যেন তার সঙ্গে না থাকি। আমি আমার ওয়াদা মত কাজ করেছি, নিশ্চয়ই আমি ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। যখন তুমি মিলনের উদ্দেশ্যে তোমার স্ত্রীর হাত পাকড়াও করেছ, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তোমার বিবিকে ছেড়ে গিয়েছি। আর অমনি সে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। মুসা মনে রেখ, যে মুহূর্তে আমি মানুষকে ছেড়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে তার জীবনলীলা সাংগ হয়ে যায়। আমার অলক্ষ্য প্রভাবের কারণেই মানুষ জীবন্ত থাকে, কথা কয়, ভাষা পায়, সঞ্চরণশীল হয়। তাই আল্লাহ্ বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন "তুমি কি একাই চল, না কেউ তোমাকে চালায়?"

তাই জ্ঞানী লোকেরা ভেবে বলেছেন, জীবনে কত বইয়ের কত থিওরির কথা বিশ্বাস করেছ, অথচ তুমি কিভাবে চল, তার কারণ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলে না? তাই–

ভাবনা কিছু রয়ে গেল আরো,
যদি ভাবার মত ভাবতে পার।
আপনারে তুমি আপন আড়ালে রেখে,
নিজে কানা হয়ে অন্যরে গেলে দেখে।

একটি প্রশ্ন

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষের চেয়ে রহস্যাবৃত প্রাণী আর নেই। অধিকাংশ মানুষই নিজের সম্বন্ধে খুব কমই ভেবে থাকে এবং অনেকেই এ ভাবনার সূত্রও ঠিকমত ধরতে পারে না। প্রথমেই ভাবতে হয় মানুষ কি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছে অথবা কেউ তাকে সৃষ্টি করেছে? অনেকে বলে থাকে, মানুষ একা একাই সৃষ্টি হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তার সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু চিন্তা না করলেও চলে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির আদি তথ্য কি? মায়ের পেটের গভীর অন্ধকারে একান্ত অসহায়ভাবে পড়ে থাকা এক ফোটা পানি বিন্দু (যে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে) হয়ে মানুষ যখন অবস্থান করছিল সেই পানি বিন্দুতে নাক ছিল না, মুখ ছিল না, মাথা, হাত, পা অর্থাৎ কিছুই ছিল না। এ মানুষ যদি একা একা নিজের ক্ষমতায় বড় হয়ে গড়ে উঠতে পারতো, তবে সেই পানি ফোটার-নিশ্চয়ই নাক, মুখ, চোখ, কান, হৃৎপিন্ড, প্লীহা, কিডনী ইত্যাদি তৈরী করার ক্ষমতা ছিল। তাই যদি সম্ভব হত, তবে এখন তো একটা পঁচিশ বছরের যুবক আপনি হয়েছেন, এখন আপনি আপনার মত একজন মানুষ সৃষ্টি করে দেখান। অন্তত শুধু **মানুষের মাথার একটুখানি ব্রেইন বা মস্তিষ্কটুকুই সৃষ্টি করে দেখান। একা না পারলে বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানী ডেকে জোট বেঁধে একটা মস্তিষ্ক সৃষ্টি করে দেখান**। নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে যদি থাকেন, এ বিশ্বের কারোর কাছে আপনার ঋণ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। মানুষ মহাচেষ্টা করেও একটি মানুষের মত জীবন্ত প্রাণী আজও সৃষ্টি করতে পারেনি। তা'হলে কেউ এ মানুষ নৌকাখানা মায়ের পেটের অন্ধকার কবরে গড়েছিল। কে সেই অদৃশ্য শক্তি যাকে বাদ দিয়ে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করাটা সমীচীন নয়?

মানব সৃষ্টি রহস্য

কি করে মানুষ হল? কেমন করে মানুষ দুনিয়ার আলোয় প্রকাশ হল? বিজ্ঞানীদের মতে, জীবকোষ (Cell) দিয়েই মানুষের গোটা দেহ সৃষ্টি হয়েছে। একটা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে তিরিশ কোটি কোটি জীবকোষ রয়েছে। প্রতিটি কোষে আবার রয়েছে কয়েকটি অংশ। এগুলোর যথাক্রমে নাম হচ্ছে-প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm), সাইট্রোপ্লাজম (Cytoplasm), নিউক্লিয়াস (Nucleus), ক্রোমোজম (Chromosome), জিন (Gene) এবং জিনের ভিতরে রয়েছে জেনিটিক নট বা গেরো যার ভিতরে রয়েছে নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid), এই এসিডই হচ্ছে আমাদের জীবনী শক্তি। জীবকোষ বা সেল নিয়ে একটু আলোচনা না করলে জীবন রহস্য বোঝা যাবে না।

আজ থেকে সোয়া চার'শ বছর আগে শ্লেডেন ও শোয়ান বলে দু'জন জার্মান বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে বললেন, প্রতিটি জ্যান্ত জিনিস কোষ নামে এক প্রকারের একক (Unit) নিয়ে সৃষ্টি। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের দেহ ত্রিশ কোটি কোটি জীবকোষ দিয়ে তৈরী হয়েছে। এই কোষই মানব দেহের আসল উপাদান, এর ভিতরেই রয়েছে জীবন্ত প্রাণীর প্রাণশক্তি।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যায়, একটি কোষে বিভিন্ন রকমের উপাদান রয়েছে। সহজ কথায়, প্রোটোপ্লাজম নামে একটি পদার্থ দিয়ে কোষটি তৈরী। এর ভিতরে সাদা সাদা এক প্রকার পদার্থ কাল কাল হয়ে অবস্থান করছে। এটাকে সাইটোপ্লাজম বলা হয়। সাইটোপ্লাজম হচ্ছে কোষ, দেহ তৈরীর মূল উপাদান, এটা নরম জেলির মত এক প্রকারের জিনিস। সাইটোপ্লাজমের ভেতরেই রয়েছে অপেক্ষাকৃত ঘন, কাল, জেলির মত জীবনের রহস্যময় পদার্থ নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসগুলোর ভেতরে রয়েছে জীবনের সবচেয়ে রহস্যময় কণা। এগুলো সুতার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের জট পাকানো অবস্থায় রয়েছে। এগুলোর নাম হচ্ছে ক্রোমোজম (Chromosome)। এদের সংখ্যা মানুষের বেলায় ছয়চল্লিশটি, অন্যান্য প্রাণীর বেলায় বেশি কম হয়, যেমন– ঘোড়ার কোষে ৬০টি, কুকুরের কোষে ৪২টি। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে, ক্রোমোজমের ভেতরে জিন (Gene) বলে আরও সূক্ষ্ম কাঠামোর মত যার চারদিকে চারটা নট বা গেরো রয়েছে। এই নটগুলোর মধ্য দিয়ে নিউক্লিক এসিড বলে একটা অতি রহস্যময় পদার্থ চলমান আছে, যেটা হচ্ছে আসল জীবনীশক্তি, যে শক্তি প্রতিটি প্রাণীকে জীবন্ত রাখে। মাতৃগর্ভে শিশু কেমন আকৃতি পাবে, কেমন ব্যক্তিত্ব হবে, এমন কি চুল বা চোখের রং পর্যন্তও এই জিনই নিয়ন্ত্রণ করে। কাল মানুষের ঘরে কোন কোন সময় ফর্সা সন্তান জন্ম হয়। হয়ত পূর্ব পুরুষের কোন ফর্সা মানুষের জিন ক্রমাগতভাবে বংশ

পরম্পরায় নামতে নামতে কালো মানুষটির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়ে ফর্সা সন্তানের সৃষ্টি হয়েছে।

ভাববার কথা

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে প্রোটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোজম, জিন এমনকি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি নিউক্লিক এসিডও সৃষ্টি করতে পেরেছেন। একটা মানুষ মরে গেলে তার সম্পূর্ণ দেহটি অবিকল অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, শুধু সে জন্মের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। তার বাকশক্তি, শ্রবণ শক্তি, ঘ্রাণশক্তি, বুদ্ধি, চিন্তা, হৃৎপিন্ড সবই ঠান্ডা হয়ে যায়, কিন্তু দেহের নাক, মুখ, চোখ, কান, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস ইত্যাদি সবই তো ঠিক থাকে, তাহলে মরে কি?

বিশ্বের বিজ্ঞানীরা দেহ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে মাথা ঝেঁকে চিন্তায় ঘর্মাক্ত হয়ে পেরেশান হয়ে স্থির মন্তব্য করে বলেছেন, মানুষের মরে কি, তা তো ঠিক বোঝা যায় না। কেউ বলেছেন, সকল অঙ্গগুলো এক সময় নিস্তেজ হয়ে যায়–এটাই মরণ। কেউ বলেছেন, জীবকোষ গুলোই মরণশীল। এরা এক সময় স্থবির হয়ে যায়- এটার নামই মৃত্যু। এরকম আরও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মরণ সম্বন্ধে করা হয়েছে। কিন্তু আসলেই কি এসব কথা যথার্থই মরণের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা? মরণ কি সত্যিই আমাদের ধারণার (Idea) মরণের মত? একটা মানুষ মরণের পরে তার অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তো ঠিক থাকে। যেমন– চক্ষু ঠিক থাকে, অনেকে মরণোত্তর চক্ষু হাসপাতালে দান করে যায়।

বিজ্ঞানীদের মাথায় সব ধরণের বুদ্ধি যদি থাকতই তবে মানব জীবনের জীবনীশক্তি, যার কারণে মানুষ জ্যান্ত থাকে, যার নাম হচ্ছে নিউক্লিক এসিড, যার সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে, তবে মানুষ মরে গেলে সেই এসিড দু-এক মাত্রা মৃতদেহের ভিতরে ইনজেক্ট করে দিলে মানুষ কেন বেঁচে উঠে না? কেন খাড়া হয়ে কথা বলা শুরু করে না? চোখ মেলে প্রিয়জনের মুখের দিকে ফিরে চায়না? তাইতো কবি গেয়েছেন–

যারে তুমি ডাক আঁখি নীরে
সে যে আর আসিবেনা ফিরে
সে যে চলে গেছে দূর ধামে।

এখানে এসে বিজ্ঞানীরা মাথা নত করে স্বীকার করে বলেছেন, নিশ্চয়ই আছেন একজন

যার হুকুমেই মৃত্যু ঘটে। তাই কবি বলেন,

নিশ্চয় আছেন একজন
যে অর্থে আমরা বুঝি,
যে অর্থে আমরা খুঁজি
হয়ত তিনি নন তেমন
নিশ্চয়ই আছেন একজন।

মানুষ মরে গেলে আসলেই কি সে মরে? এ সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্র আংশিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। আসলে যে মরে সে হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা বিজ্ঞানের, দর্শনের এবং বিজ্ঞানীর, দার্শনিকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

মানুষ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই শুধু জানেন মরণে কিসের মরণ হয়। কি মরণের কারণে মানুষের দেহ মরে। কেউ বিশ্বাস না করলেও যিনি মানুষের মৃত্যু ঘটান তিনি বলেন "বল (হে মুহাম্মদ সাঃ) মানুষের জীবন আমার একটা আদেশ (Order) মাত্র, যার নিরসনই মানবদেহের মৃত্যুর আসল কারণ এবং এ সম্বন্ধে মানুষকে কোন জ্ঞানই দেয়া হয়নি।" (আল-কুর'আন) স্রষ্টার সেই আদেশটি হচ্ছে আসল মানুষ। দেহ হচ্ছে নকল মানুষ। এই আদেশটি যেন সর্পের মত, মানব দেহটি সেই সর্পের খোলসের মত। আসল সাপ খোলস এড়িয়ে হালকা হয়ে চলে যায়, খোলসটি পথের ধারে পড়ে থাকে নিশ্চল হয়ে। আসল মানুষটির খোলস মানুষের মতই দেহ আছে, আছে নাক, কান, মুখ, হাত, পা, মাথা, জিহ্বা, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত-ইত্যাদি কিন্তু অদৃশ্য বা গায়েব। সে তার অলক্ষ্য দেহ নিয়ে এই জড় দেহে আশ্রয় করে তাকে। সে যখন বিদায় নিয়ে যায়, খোলস দেহের সর্ব অঙ্গ ঠিক থাকা সত্ত্বেও দেহ আর নড়াচড়া করে না, চির জনমের মত তার স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। আসল মানুষ দেহাভ্যন্তর থেকে তার আসল জিহ্বা টান দিয়ে নিয়ে চলে যায়, নকল মানুষের এই মাটির জিহ্বা আর কথা বলে না। আসল মানুষ ভেতর থেকে আসল চোখ টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়, এই মাটির চোখে আর রোশনাই থাকে না। এমনিভাবে আসল মানুষ তার হৃৎপিন্ড সরিয়ে নিয়ে যায়, নকল মানুষের হৃৎপিন্ডের স্পন্দন চির জনমের মত বন্ধ হয়ে যায়।

জীবন সৃষ্টির আসল রহস্য

কোষই (Cell) প্রতিটি প্রাণীর জৈবদেহ জীবন্ত থাকার মৌলিক কারণ। কেমন করে জীবকোষ সৃষ্টি হয়, অতি আশ্চর্যভাবে জীবকোষের সৃষ্টি হয়। নারী এবং পুরুষ দুই শ্রেণীর মানুষ। একটি নারীশিশু চারি লক্ষ ডিম্বকোষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর অঙ্গে থাকে ডিম্বকোষ নামে জীবকোষ। ফ্যালোপিয়ন টিউব নামে চার ইঞ্চি লম্বা একটা টিউব নারীর গর্ভের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করে। সেই টিউবের মাথায় একটি থলের মত থাকে তাকে বলে ডিম্বাধার (Ovary) অর্থাৎ ডিম্বকোষ বাস করার ঘর। পরিণত বয়স হলে এই ডিম্বাধারের ভিতরে ডিম্বকোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সন্তান ধারণের ক্ষমতা (Mature) প্রাপ্ত হয়। এই ডিম্বেকোষে মোট ৪৬টি ক্রোমোজম থাকে যার কথা আগেই বলা হয়েছে। ফ্যালোপিয়ন টিউবটির মাথা নারীর সন্তানের ঘরের (Uterus)-এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে, অর্থাৎ যেখানে সন্তানের জন্ম হয় সেই স্থানে এসে মিশেছে। প্রতি মাসে নারীর শরীর নাপাক (Menstruation) হওয়ার পরে ডিম্বকোষ ডিম্বাধার ছেড়ে পরিপক্ক অবস্থায় ফ্যালোপিয়ন টিউবের ভিতর দিয়ে ক্রমাগতভাবে বেরিয়ে আসতে থাকে গর্ভাশয়ের দিকে। এ সময়ে গর্ভাশয় সন্তান ধারণের জন্য তৈরী হয়। বেশী করে রক্ত জমায় এবং তার পেশীগুলো জোরালো হয়। ডিম্বাধার থেকে বেরিয়ে আসার সময় ডিম্বকোষের ভিতর থেকে ২৩টি অপ্রয়োজনীয় ক্রোমোজম ঝরে যায়, বাকী থাকে আর ২৩টি এই ২৩টি ক্রোমোজম নিয়ে গর্ভাশয়ের দিকে যখন ডিম্বকোষটি আসতে থাকে, তখন নারী-পুরুষের মিলন হয়ে পুরুষের ভেতর থেকেও শুক্রকোষ বেরিয়ে যায়। শুক্রকোষ কতগুলো কীটের সমষ্টি যাকে স্পার্ম বা শুক্রকীট বলে। শুক্রকীটেও (Sperm) রয়েছে ২৩টি ক্রোমোজম, শুক্রকীটগুলো দেখতে অতি ক্ষুদে সাপের মত মাথা মোটা, লেজ তার দশগুণ। এ লেজ দিয়ে সে অনায়াসে সাঁতার কেটে সামনে বেড়ে চলতে পারে। একজন পুরুষের এক ফোটা বীর্যের ভিতরে প্রায় সাড়ে আট কোটি কীট রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এ প্রত্যেকটির ভিতরে রয়েছে ২৩টি করে ক্রোমোজম এবং এর প্রত্যেকটিই এক একটি মানুষ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, এ দুনিয়াকে কয়েকবার জনাকীর্ণ করার জন্য একজন পুরুষই যথেষ্ট।

নারী-পুরুষ মিলনের পরে কোটি কোটি শুক্রকোষ নারীর গর্ভের দিকে দৌড় দেয়। এত জোড়ে তারা দৌড়ায় এবং তাদের মধ্যে এত ঠেলাঠেলি হয় এবং দৌড়ের এত প্রতিযোগিতা হয় যে, অলিম্পিক দৌড় প্রতিযোগিতাও এরূপ হয় না। শুক্রকীটগুলো এত

দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে কার আগে কে নারীর ঐ ডিম্বাশয়ে ঢুকে যেতে পারে। যে আগে ঢুকবে সেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠবে। এদিকে নারীর ডিম্বাশয় বা কোষটি দরজা খুলে অপেক্ষায় আছে কোনসময় তার দরজার ভিতরে একটা শুক্রকীট মাথা ঢুকাবে, অমনি তার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। নারীর ডিম্বকোষ ও পুরুষের শুক্রকোষ যেই মাত্র মিলন হবে অমনি মানুষ সৃষ্টি শুরু হবে। শুক্রকীটগুলো অতি দ্রুত দৌড়ায়। প্রতি আট ঘন্টায় তারা এক ইঞ্চি জায়গা সাতরায়ে পার হয়। দৌড় পাল্লার সময় তারা এত কাছাকাছি এবং এত লাগালাগি হয়ে থাকে যে আণবিক দূরত্বের (Moleculer Distance) চেয়েও কম। বিজ্ঞানীরা বলেন, দু'টো শুক্রকীট যদি একবারে একই সময় একটা ডিম্বকোষের ভিতরে ঢুকে তবে সন্তান ধরবে না, একটি ডিম্বকোষে একটি শুক্রকীটই ঢুকতে হবে।

ভাববার কথা

স্বামী স্ত্রী মিলনের পর শুক্রকীটগুলো ডিম্বাশয়ের দিকে ছুট না দিয়ে উল্টো দিকে দৌড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারত। আরো ভাবার কথা হচ্ছে, গর্ভাশয়টি নিম্নগামী। শুক্রকীটগুলো উর্দ্ধগামী হয় কেন? কোটি কোটি মানুষ যখন এত লাগালাগি এত নিকটতম এবং তারা যখন ডিম্বকোষের ঠিক দরজার সামনে যায়, তখন তাদের ভিতরে থেকে আরও কোটি কোটি মানুষ পোকাও অতি নিকটবর্তী অবস্থা থেকে একটা পোকা যখনই একটু মাথা বাড়িয়ে ডিম্বাশয়ে অতি সামান্য একটু অংশ ঢুকাতে চায় তখনই তাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে এ ডিম্বাশয়ের দরজাটি কে বন্ধ করে দেয় এবং বাদ বাকী কোটি কোটি মানুষ কীট অন্ধকার পথে ঝরে যায়, নালা নর্দমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যিনি এ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি বলেন, বলত গভীর রাতে মিলনের পর যখন তোমার মাতা ঘুমিয়েছিল তুমি আজকের এই পরিপাটি সাহেবটি তো তোমার মায়ের ডিম্বাশয়ের দিকে কোটি কোটি ভাইবোনের সঙ্গে অত্যন্ত জটিলতরভাবে ঢুকতে গিয়েছিলে, তোমার একটুখানি দেহকে তোমার মায়ের ডিম্বকোষে ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এ ডিম্বাশয়ের মুখটি কে বন্ধ করে দিয়েছিল? আমি, না তুমি নিজে? তোমার সঙ্গে যদি আরও একটা পোকা ঢুকতে সুযোগ পেত তবে আজ তুমি প্রস্রাব-পায়খানার নর্দমায় আবর্জনা হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে। মানুষ নামে কেউ তোমাকে চিনত না। একথা ভেবে কি দেখে কোনদিন নিবিষ্ট মনে? অনেক বিজ্ঞানীরা, যুক্তিবাদীরা বলে ঐ সব একাই হয়েছে। আসলে তোমার জন্মকালে, অতি অন্ধকারে মাতৃগর্ভের সূচনায় কিভাবে তোমার জন্ম শুরু হয়েছিল, তা কি তোমার মনে আছে এবং তুমি কি থেকে এসেছ কেউ কি তা সঠিক করে বলতে পার? যেখানে তোমার কোন শক্তি খাটেনি, বুদ্ধি খাটেনি একান্ত অসহায় একটা পোকা জন্মের কোন কথাই মনে নেই সেখানে এত জোর দিয়ে কেমন করে বলছ, মানুষ একা একাই হয়েছে? তাই আল্লাহ্ বলেন, বিবেকী মানুষ যেন ভেবে দেখে কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। "মিন আইউ শাইয়েন খুলেকা" (আল-

কুর'আন)। তিনি আরও বলেন, "তুমি কি একাই সৃষ্ট হয়েছো, না তোমাকে কেউ সৃষ্টি করেছে?" (আল-কুর'আন) আর একটি প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞানীরা দিতে পারেনি। শুক্রকীট ধীরে ধীরে স্ত্রীর ডিম্বকোষের দিকে এগিয়ে যায়। ডিম্বকোষটি ক্রমে ক্রমে গর্ভাশয়ে এসে পড়ে। পুরুষের শুক্রকোষে থেকে ২৩টি ক্রোমোজম, নারীর ডিম্বেকোষে থাকে ২৩টি ক্রোমোজম। উভয়কোষ যখন একত্রে মিলিত হয়, তখনই ৪৬টি ক্রোমোজম মিলে অতি অদ্ভুতভাবে এবং এক অজানা অভিনব রূপে জীবনের শুরু হয়। বিজ্ঞানীরা মাথা ভেঙ্গে আজও এ অভিনব জীবনধারার কারণ খুঁজে বের করতে পারেননি। তাই তারা মাথা নুইয়ে বলেছেন,

জীবনের এই অভিনব ধারা
কোথা হতে নেমে আসে,
কে যেন হেথায় খেলা খেলে যায়
বুঝিনা থাকিয়া পাশে।

বিজ্ঞানীরা আরও হতবাক হয়ে স্রষ্টার কাছে নতি স্বীকার করেছেন। ডিম্বকোষের ২৩টি ক্রোমোজম এবং শুক্রকোষের ২৩টি ক্রোমোজম একত্র মিলিত হলে ৪৬টি ক্রোমোজমেরই এক পূর্ণাঙ্গ কোষ বা সেল সৃষ্টি হল এবং এটিই হল প্রথম জীবকোষ যা থেকে এখন ধীরে ধীরে মানব শিশু বেড়ে উঠতে থাকবে। কিন্তু এ কোষটি কোথায় মানুষ সৃষ্টির ফ্যাক্টরী পাবে। নারীর গর্ভের ভিতরের যে কোন এক স্থানে এ মিলিত কোষটি সট্ করে এক জায়গায় আটকে যায়। শত ঝাকিতেও নড়ে না খসে পড়ে না। অত্যাশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ কোষটির গায়ে শিরিষ আঠার মত কোন আঠা নেই। বড়শীর মত কোন বাকানো ফাল নেই, নেই কোন হুক। বিজ্ঞানীরা হয়রান হয়েছেন যে, কি করে এ কোষটি মাতৃগর্ভে একা একা আটকে থাকে। মহাস্রষ্টা উত্তর দেন, 'এ আমার আদেশ, আমার অলক্ষ্য নির্দেশ, আমি নাপাক পানি থেকে একটি মাংস পিণ্ড সৃষ্টি করি, পরে মানুষের আকার নেই।' (আল-কুর'আন)

কেমন করে মানুষ হয়-অবাক কথা

পুরুষের ২৩টি ক্রোমোজম নারীর ২৩টি ক্রোমোজম একত্রে মিলিত হয়ে প্রথমে একটি কোষ গঠিত হয়। পরে ধীরে ধীরে এই কোষটি বিভক্ত হতে থাকে। যেমন– প্রথমে একটি কোষ ছিল, সেটি দু'টো নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়ে ডাম্বেলের আকার নিল। পরে দু'টো পূর্ণ কোষে বিভক্ত হয়ে গেল, এভাবে বিভক্ত হয়ে চারটি হল। তারপর আটটি, এরপর ষোলটি-এভাবে বিভক্ত হতে হতে ত্রিশ কোটি কোটি জীবকোষ সৃষ্টি হয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের মাথা হেট হয়ে গেছে এবং এখানে দু'টো প্রশ্নের জবাব আজও অনুসন্ধান করে বের করতে পারেনি।

প্রথমত ঃ প্রথমে একটি জীবকোষ থেকে মাত্র ৫০ বা ৫২ বার ভাগ হলেই ত্রিশ কোটি কোটি জীবকোষ কেমন করে সৃষ্টি হয়? এটা কোনভাবে অংক কষে সমাধান করা যায় না, অর্থাৎ প্রথম কোষটি থেকে ত্রিশ কোটি কোটি কোষ হতে প্রথম কোষটিকে মাত্র ৫০ বার বিভক্ত হতে হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ কোষ বা সেলগুলো কেন এত সহস্র ধারায় বিভক্ত হয়? এর কোন ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নি। তারা শুধু বলেন, কোষ বিভক্ত হয় কেন, তা তিনিই জানেন যিনি কোষ সৃষ্টি করেছেন। মহাস্রষ্টা, মহাপ্রকৌশলী জানিয়েছেন "কোষ বিভক্ত করি আমি। আমিই তাকে নির্ধারিত রূপদান করে মানুষ সৃষ্টি করে তুলি।" মহাস্রষ্টার একথা যিনি অনুধাবন না করতে পেরে শুধু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত মনে করেন, তিনি বিজ্ঞানীদের অযোগ্যতাটাকেও গোয়ার্তুমী করে যোগ্যতা বলে মেনে নিয়ে আসল যোগ্য শক্তিকেই অস্বীকার করেন। এতে তার নিজেকেই যে অস্বীকার করে, চিরজীবন নিজে কে ভুলের শিকার করে রাখার চেষ্টা হল, এটা সে কিছুতেই অনুধাবন করতে না পেরে অবিশ্বাসী হয়ে থাকল, তাতে তার একটু লজ্জাও হল না। শিক্ষার অপচয় হয় কখন? **যখন শিক্ষা একগুয়েমিতে ভোগে, নেহায়েত সত্য কথাকে সে যুক্তি খাটিয়ে মিথ্যা দিয়ে আবৃত করে রাখতে চায়। সে ধীরে ধীরে তার জ্ঞানেরও অলক্ষ্যে কখন যে মুর্খ হয়ে যায়, তা সে টেরও পায় না।** তাই মহাস্রষ্টা বলেন, "হে মানুষ! তুমি কি বেকুব হয়ে গেলে, তোমার কি একটুখানি জ্ঞানও নেই? আমি সৃষ্টি করেছি তোমাকে, তবু তুমি নিমকহারামের মত আমাকে অস্বীকার করবে?" (আল-কুর'আন)

কোথায় ছিলাম, কেমন ছিলাম, কে আমি,
আবার কোথায় হারিয়ে যাব এই আমি।

হয়ত ফিরে আসব না আর এই ধরায়,
যে যাব সে চলেই যাব, হায়রে হায়।
অতীত নাই আর আজকে মনে, সবই ভুল,
হয়ত কখন ঝড়েই যাব, এই মুকুল।

আশ্চর্য কারখানা-মানুষের মস্তিষ্ক

মানুষের মাথার মগজে এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যা বিশ্বের কোন বিজ্ঞানী আজও পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি।

মাথাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গুরু মস্তিষ্ক (Cerebrum); লঘু মস্তিষ্ক (Cerebellum) এবং মেডুলা অবলোংগাটা (Medula oblongata) অর্থাৎ মেরুদন্ডের অভিমুখী মাথার যে অংশটা নেমে গেছে। অল্প বয়সে মাথার মগজের ওজন দ্রুত বেড়ে চলে। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ মানুষের মাথার মগজের ওজন ১৩৮০ গ্রাম। নারীদের বেলায় কম, ১২৫০ গ্রাম অর্থাৎ পুরুষের মগজের ওজন ২২.০৮ ছটাক, নারীদের কিছু কম (২০ ছটাক)। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের মাথার ওজন তার দেহের তুলনায় অনেক বেশী। তিমি মাছের বিরাটাকার দেহের তুলনায় মাথার মগজের ওজন মানুষের চেয়ে মাত্র ৫ গুন বেশী। হাতীর মগজও অন্য প্রাণীর চেয়ে ভারী, মানুষের মগজের চেয়ে তা তিনগুণ ভারী। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের গুরু মস্তিষ্কের ওজন বেশী বলে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশী অসাধ্য কাজ সাধন করতে পারে, বেশী বুদ্ধি-সুদ্ধি রাখে।

মাথা কেমন করে কাজ করে? মগজ থেকে টেলিফোনের তারের মত কতকগুলো তার বেরিয়ে সারাদেহে ছেয়ে আছে। তারগুলো ক্রমে ক্রমে খুব সূক্ষ্ম হয়ে দেহের আনাচে-কানাচে মিশেছে। মগজে একটা সুইচ বোর্ডের মত জিনিস আছে, যেখান থেকে সার-াদেহে খবর নেয়া-দেয়া চলছে। পায়ে একটা কাঁটা বিধলে অমনি সে খবর ঐ সুইচ বোর্ডে গিয়ে ঠেকে। সেই বোর্ড আবার ঐ খবর এক্সচেঞ্জ করে মগজে পাঠায়। এইভাবে মাথায় হর-হামেশা এক্সচেঞ্জ বোর্ড থেকে বিভিন্ন অঙ্গে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জ ন্য যে তন্তুগুলো বয়ে নেয় বা যে তারগুলো বয়ে নিয়ে থাকে, তাকে বলে গতিশীল স্নায়ু (Motor nerve) এবং পায়ে কাটা ফোটার খবরটা যে স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কে নিয়ে যায়, তাদেরকে বলে অনুভূতি স্নায়ু (Sensory nerve)। এরা বেদনা, শীত, গরম ইত্যাদির খবর মস্তিষ্কে পাঠায়। এই অনুভূতি স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কে যাবার আগে একটা ব্যাপার ঘটে। সরকারের যেমন স্থানীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার থাকে, মাথার বেলায়ও তাই।

স্থানীয় সরকার ছোট খাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধলে পুলিশ ফোর্স দিয়ে কোন মতে সেগুলো ঠাণ্ডা করে এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানায়। কেন্দ্রীয় সরকার তখন ফোর্স পাঠিয়ে বা অন্যভাবে সে সমস্যার মোকাবেলা করে। অনুরূপভাবে, কোথাও কোন কাঁটা ফুটলে বা আঘাত লাগলে গতিশীল স্নায়ুগুলো সে খবরটা মস্তিষ্কে টেলিফোন করার আগে, সে স্থানীয় একটা বোর্ডের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ কাঁটা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় স্নায়ুগুলো সজ াগ হয়ে চট করে পাটাকে টান দেয় বা মুখে আহ্-উহু শব্দ বেরোয়। পরে মস্তিষ্কে এ খবর গেলে মস্তিষ্ক হাতকে ফোন করে জানায় কাঁটাটা তুলে ফেল। এই যে স্থানীয় (Local) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বোর্ড, একে প্রতিফলন ক্রিয়া (Reflex action) বলে। যখন জেগে থাকি বা সচেতন থাকি, তখন অধিকাংশ কাজই আমাদের ইচ্ছাধীন থাকে। যেমন– কাঁটা, খাওয়া, পড়া, দেখা, শোনা ইত্যাদি। কিন্তু কত কত কাজ আছে যা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। যেমন ঘুমিয়ে থাকলে হৃৎপিন্ড, পাকস্থলী, ফুসফুস ইত্যাদি আমাদের জ্ঞানেরও বাইরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতে থাকে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন কাজ বা স্বয়ংক্রিয়া (Involuntary or Automatic) কাজ বলে।

মাথার মগজের এক্সচেঞ্জ সেন্টারটি (Exchange centre) এতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যে, আজও কোন বিজ্ঞানী এর আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। মগজে অনবরত অনুভূতি (Sensory nerve) স্নায়ু দিয়ে যে খবর যায়, তা অজস্র রকমের হয়। যেমন–কান একটা বকা শুনল অমনি সেটা মগজে পাঠিয়ে দিল এক্সচেঞ্জ করে মগজ সে বার্তা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখকে আদেশ দিল, পাল্টা জবাব দাও। চক্ষু একটা বিষাক্ত সাপের খবর এক্সচেঞ্জ করে মগজে পাঠিয়ে দিল, মগজ থেকে এক্সচেঞ্জ বোর্ডের মাধ্যমে গতিশীল স্নায়ু (Motor nerve)-এর ভিতর দিয়ে হাতকে আদেশ দিল, সামনেই লাঠি আছে, সজোরে মাথায় আঘাত কর। এমনিভাবে হাজার হাজার খবর স্নায়ু দিয়ে এক্সচেঞ্জ বোর্ডের মাধ্যমে মগজে যায় এবং হাজার হাজার খবর গতিশীল স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে ফোন হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের মগজের একচেঞ্জ বোর্ডটি এত দুরূহ এবং এত বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতির সমাবেশ তাতে জড় হয়েছে যে, এ যন্ত্রপাতিগুলো যদি কোন স্থানে বসানো যেত তবে তার আয়তন এত জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হত যে, আমেরিকার এম্পায়ার এষ্টেট বিল্ডিং-এর মত ছ'টি বিল্ডিং-এর প্রয়োজন হত। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে সারা বিশ্বের উঁচু বিল্ডিং এটাই ছিল। এই বিল্ডিং একশো এক তলা উঁচু, গগনচুম্বী এবং টেলিফোনের তারের ক্যাবলের ওজন হত কয়েক শত টন। এই যন্ত্রপাতি যখন অতি দ্রুত এক্সচেঞ্জ হতে থাকে তখন এগুলো এত উত্তপ্ত হয় যে, আমেরিকার হাডসন নদীর মত বিশাল নদীর সবটুকু পানি নিংড়ায়ে ঢাললে হয়তোবা এসব যন্ত্রপাতি ঠান্ডা হতে পারে।

ভাববার কথা

এতবড় একটা এক্সচেঞ্জ অফিস যার বিশালত্ব হয় একশো এক তলা বিল্ডিং-এর ছ'টার সমান এবং যার যন্ত্রপাতির ওজন হয় কয়েক শত টন, মাথার একটুখানি মগজের এককোণে পড়ে থাকে, এটা ভাবতেও অত্যন্ত অবাক লাগে। মগজের অন্যান্য কাজতো বাকীই রয়ে গেল। মগজ (Brain) অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে জীবনের দুরূহ কাজগুলো সমাধা করে। এই মুহূর্তে আপনি এই বই পড়ছেন, ভাবছেন, মন্তব্য নিচ্ছেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের পড়াশুনা, চলাফেরা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি মগজ যে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, তার রহস্য মানুষের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। তারা আরো বলেছেন, অনেক বড় বড় বই লেখা হলেও কেউই আসলে মগজের কর্মধারার আসল রহস্য আজও আবিষ্কার করতে পারেননি এবং হয়তো কোনদিনই পারবেন না। একটা টাকা মাটিতে পড়ে গেলে আপনি উপুড় হয়ে সেটি তুললেন, এর মধ্যে মগজ যে কি কাজ করল কেউ আজও তা সঠিক করে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। **যারা বুদ্ধিমান লোক তাদের জন্য অনেক অনেক ভাববার বিষয় রয়েছে এতে। আপনি অফিসে বসে একটা স্টেটমেন্ট লিখছেন। কথার পর কথা গুছিয়ে লিখে যাচ্ছেন, আপনার ভিতরে বসে কে এই কথাগুলো গুছিয়ে দেয়, ভেবে দেখেছেন কি কোনদিন?** আপনি মাথা খাটিয়ে একটি মেয়েকে বিয়ে করার স্থির করলেন। এই সিদ্ধান্তটা আপনার ভিতর থেকে কে করে দিল? একটি অপরিচিতা মেয়েকে স্ত্রী করে ঘরে এনে গলায় তার সোনার হার পরিয়ে দিলেন। যে এই হার দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিল তাকে আপনি কি দিলেন? তাকে কি কোন দিনও খোঁজ করেছেন, যে আপনার বুকভরা, আপনার প্রিয়জনের বুকভরা ভালবাসা দিয়েছিল? কে ভালবাসতে শেখালো? ভালবাসা কি? কোথায় থাকে, কে তাকে উজ্জীবিত করে প্রেমিকের অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়তে সাহায্য করে, কবির কণ্ঠে কবিতা হয়ে প্লাবিত হয়ে যায়?

বুকভরা এই ভালবাসা কে দিয়ে আমারে,
লুকাইয়া রহিল সে কোন বা পাথারে।
কে রে কথা বলে যায় অলক্ষ্যে থাকিয়া,
কে আমারে কণ্ঠ দিল আমাতে লুকাইয়া।

মগজের আরেকটি আশ্চর্য ক্ষমতা যা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে অবাক হয়েছেন। মগজের আশ্চর্য একটি ক্ষমতা স্মৃতিশক্তি। একটা ছবি বা অভিজ্ঞতা মগজের স্মৃতি রেখায় কিভাবে যে আটকে থাকে, তার ব্যাখ্যা কেউ করতে পারেনি। মগজে স্মৃতি রেখা বলে অতি সূক্ষ্ম জিনিষ আছে যাতে স্মৃতি আটকে থাকে। আশি বছরের বৃদ্ধ ১১ বছর বয়সে একটা বাঘ দেখেছিল জঙ্গলের ভিতরে অথবা একটা মেয়ে আপনার ছাত্র বয়সে কি আচার-ব্যবহার করেছিল, আপনার সাথে কি মধুর ভাষায় সম্বোধন করেছিল, আজ চল্লিশ বছর পরে অবিকল তা মনে পড়ে, ভুল হয়না। এমনি কত কোটি কোটি কথার মালা, দৃশ্যের আলেখ্য, কথা-কাহিনীর ভীড় মানুষের স্মৃতিপটে অবিকৃত অবস্থায় থাকে, মোটেও মুছে

যায় না, ব্রাস বা শিরিষ দিয়ে মাথার খুলি ঘষলেও তবু মুছে যায় না, বিস্মৃতি হয় না। ছবির পর ছবি, কথার পর কথা, কাহিনীর পর কাহিনী কেমন করে মনে থাকে? অ, আ, ক, খ, এ, বি, সি, ডি, আলিফ, বা, তা, ছা থেকে আরম্ভ করে বস্তার পর বস্তা বই পড়ে একটি লোক ডক্টর হয়, দুনিয়াজোড়া নামকরা বিদ্বান হয়। তার এই বস্তাবন্দী বই-এর লক্ষ লক্ষ কথা কোথায় আটকে থাকে, ঐ মগজের একটুখানি কোণে, সিকি ইঞ্চির ভেতরে? এত শত শত মণ ওজনের পাহাড় পরিমাণ বই-পুস্তক মাথার মগজের ভিতরে কোন দিগন্তজোড়া আলমারীতে জায়গা হয়। এছাড়া টেপের কথার উপরে আবার টেপ করলে আগের কথা মুছে যায়, কিন্তু মাথার কথার উপরে কোটি কোটি কথা বাজালেও আগের কথা মুছে না। একটা টেপের ক্যাসেট একবারই শুধু এক ধরনের কথা রক্ষা করে, দ্বিতীয়বার বাজালে আর সে পুরানো কথা ধরে রাখতে পারে না। মগজের ক্যাসেটে কতই না বড় ফিতা। হয়ত কোটি কোটি মাইল লম্বা, হয়ত অনন্ত।

একটা জটিলতর ইঞ্জিন-পরিপাক বিভাগ

খাদ্য না খেলে মানুষ বাঁচে না। এক অভিনব উপায়ে খাদ্য মানুষের দেহের শক্তি জে াগায়। খাদ্য খাওয়ার শুরু থেকে হজমের শেষ পর্যায় পর্যন্ত খাদ্যের বিভিন্ন রকমের স্তর পার হতে হয়। প্রথমে মুখে খাদ্য ঢুকিয়ে দিলে মুখের দুই পাশে তিনটি করে গ্রন্থি আছে (Gland) যা থেকে এক প্রকার হজমি রস বের হতে থাকে, একে টায়ালিন বলে (Ptyalin) । আসলে মুখ থেকেই হজমের কাজ শুরু হয়। হজমি রস বা লালা খাদ্যকে নরম ও দ্রবণ করতে সাহায্য করে। দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে হজমে সাহায্য করে। চিবানোর সময় খাদ্যের ক্রিয়া মস্তিষ্কেও বিস্তার লাভ করে। এজন্য মাছের মাথা বা অন্যান্য ভাল খাবার মুখ বন্ধ করে উত্তমরূপে চিবিয়ে খেতে হয়। মুখের নিম্নভাগে পাকস্থলীর নলের মুখ, ওর পাশাপাশি শ্বাসনালী। খাবার যখন খাদ্যনালী দিয়ে পাকস্থলীর দিকে যাওয়া শুরু করে তখন শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়। অমনোযোগী হয়ে খেলে বা খাবার সময় কথা বললে শ্বাসনালীতে খাদ্য ঢুকে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। খাদ্যনালী মুখের নিম্নভাগে পাকস্থলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এই নালীটাকে এসোফাগাস বলা হয়। এটা গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে, অর্থ হল আমি খাদ্য বহন করি। এই নালীতে কতকগুলো মাংসপেশী রয়েছে যেগুলো খাদ্যকে পাকস্থলীর দিকে নিয়ে যায়। পাকস্থলীতে খাদ্য ঢোকার পর কতকগুলো রস পাকস্থলী থেকে বের হয় এদেরকে এনজাইম বা পাচক রস বলা হয়। এগুলো যেসব গ্রন্থি বা তারের মত জিনিষ থেকে বের হয়, তাদের সংখ্যা তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। এই গ্রন্থিগুলো জালের মত পাকস্থলীকে ছেয়ে আছে। খাবার হজম করার সময় এরা কয়েক প্রকারের রস বের করে খাদ্যে মিশিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে লবণাম্ল অম্লরস (Hydrochloric Acid) ও পেপসিন (Pepsin) ও মিউসিন (Mucin) প্রধান। এগুলো হল পাচক রস বা হজমি রস, এগুলো খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে দ্রবণ ও তরল করে।

পাকস্থলীর পেশীগুলো খাদ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুচড়ে দুমড়ে এপাশ থেকে

ধাক্কা দিয়ে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে ওলট-পালট করে ঢেকিতে চালের গুড়া করার মত খাদ্যকে গুড়ো করে মিশ খাওয়াতে থাকে এবং একেবারে নরম ও তরল না হওয়া পর্যন্ত, প্রায় চার ঘন্টা ধরে খাদ্য নিয়ে ধস্তাধস্তি করে পাকস্থলীর পেশীগুলো ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হয় এবং খাদ্য যখন তরল পিন্ডের মত হয়, তখন তাকে একটা গেটের কাছে ঠেলে দেয়। এটি পাকস্থলীর একটি সংকীর্ণ প্রান্ত, এর নাম পাইলোরাস (Pylorous) বা তোরণ দ্বারের রক্ষক। খাদ্য যতক্ষণ পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে তরল পিন্ডের আকার ধারণ না করে, ততক্ষণ এই দ্বার বন্ধ থাকে। যখন খাদ্যটা হজমের শেষ পর্যায়ে আসে, তখন আপনা আপনি এই গেট বা দরজাটা একবার মাত্র খুলে গিয়ে খাদ্যকে পাকস্থলী থেকে বের করে দেয়। যেমন– ষ্টীমার থেকে মাল খালাস করা হয়। পাইলোরাস থেকে বেরিয়ে খাদ্য একটি বড় নলে ঢোকে, এর নাম ক্ষুদ্র অন্ত্র (Smaller Intestine)। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম অংশ ১২ আঙ্গুল প্রশস্ত, একে ডুয়োডিনাস বলা হয়। ডয়োডিনাস থেকে একটি নল পিত্তকোষের (Gallbladder) এর সঙ্গে মিশেছে, অপরটি মিশেছে ক্লোম (Pancreas)-এর সঙ্গে। পিত্তকোষ যকৃতের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র একটি থলের মত। এটা চর্বি হজম করে, এজন্য বেশী চর্বি জাতীয় জিনিস খেলে এর ওপরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। ফলে, এতে পাথ-রের (Stone) সৃষ্টি হতে পারে। ক্লোম বা প্যানক্রিয়াস গ্লুকোজ যা চিনি জাতীয় জিনিসকে ভাঙ্গিয়ে দেহে তাপ ও শক্তি জোগায়। এর ক্ষমতার বাইরে গ্লুকোজ শরীরে ঢুকলে এটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চিনিকে পূর্ণভাবে ভাঙ্গাতে না পারায় রক্তে বেশী চিনি ঢুকে যায়। ক্লোম থেকে ইনসুলিন জাতীয় একটা রস বের হয়ে গ্লুকোজ জাতীয় জিনিসকে ভাংগিয়ে একেবারে সরাসরি রক্তে মিশিয়ে দেয়। ইনসুলিন রস যখন চিনির পরিমাণে কম হয়, তখন সে চিনি রক্তে বেশী পরিমাণ জমে এবং বহুমুত্র (Diabetis) ব্যাধির সৃষ্টি করে।

পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্র অন্ত্রে খাদ্য প্রায় তরল পিন্ড অবস্থায় ঢুকলে আশ্চর্য রকমের কার্যাবলী শুরু হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রটি বিশ ফুট লম্বা কিন্তু যেভাবে এটা ভাঁজ করে পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে, তা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। স্বল্প পরিসর স্থানের ভিতর এত বিরাট একটা যন্ত্র এপাশ ওপাশ করে ভাঁজ করে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, কে যেন নিজ হাতে এটাকে গুছিয়ে রেখেছে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতরে রয়েছে আরও আশ্চর্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটি কোটি যন্ত্র যাদেরকে ভিলি (Villi) বা শুঁয়ে বলা হয়েছে। এগুলো আঙ্গুলের মত মাথা মোটা, গোড়ার দিকে একটু চিকন। পাকস্থলী থেকে প্রায় জীর্ণ খাদ্যগুলো যখন এদের ভিতরে আসে, তখন এরা সজাগ হয়ে ওঠে এবং গা নড়াচড়া দিয়ে সামনে পেছনে উপরে নীচে নাটকীয় ভঙ্গিতে দুলতে থাকে এবং খাদ্যের ভিতরে যত সার পদার্থ যেমন– প্রোটিন, গ্লুকোজ ইত্যাদি সবই ছেকে রেখে রক্তে মিশিয়ে দেয়। বাকী অপ্রয়োজনীয় যা, তা বৃহদন্ত্রের (Larger intestine)-এর দিকে ঠেলে বের করে দেয়।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের পরে বৃহদান্ত্র প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, দেখতে প্রায় চতুষ্কোণের তিন বাহুর মত। বৃহদন্ত্রেও খাদ্য অর্ধ তরল অবস্থায় থাকে। সুতরাং বৃহদন্ত্র-এর অনেক তরল পানি গ্রহণ

করে রেখে দেয়। বৃহদন্ত্রের শেষের দিকে মলদ্বার (Rectum) লম্বায় প্রায় ছ'ইঞ্চি, মলদ্বারের পরে গুহ্যনালী শক্ত গোল পেশী দিয়ে আটকানো থাকে।

খাদ্য হজম হয়ে দেহে রক্তের সৃষ্টি করে। রক্তে কয়েক প্রকার উপাদান আছে। লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অনুচক্রিকা, প্লাজমা ইত্যাদি। লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস নেই, এরা অক্সিজেন বহন করে, আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরিয়ে দেয়। সাদা কণিকাগুলো রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। প্রতি ঘন ইঞ্চি রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর শত কোটি এবং সাদা কণিকার সংখ্যা প্রায় দশ কোটি। প্লাজমা জীর্ণ খাদ্য বহন করে, এতে গ্লুকোজ, ভিটামিন, গ্লিসারিন এবং এ্যামাইনো এসিডও রয়েছে প্রায় ২২ রকমের যা দিয়ে কোষগুলো তাদের প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের পুষ্টি তৈরী করতে পারে।

কোটি কোটি শুয়ার (Villi) আবার কোটি কোটি রক্ত বিভাগ আছে। প্রত্যেকটি শুয়ার একটি ক্ষুদ্র অথচ স্বয়ংক্রিয় রক্ত বিভাগ আছে। প্রত্যেকটি শুয়ার একটি করে উপধমনী বা রক্তনালী আছে। এভাবে কোটি কোটি শুয়ার কোটি কোটি উপধমনী এবং প্রত্যেকটি শুয়ার একটি করে শাখা শিরা আছে। উপধমনী দিয়ে রক্ত শুয়ায় ঢোকে এবং শিরা দিয়ে রক্তগুলো বেরিয়ে যায়। এভাবে প্রত্যেকটি শুয়ার দিকে কোটি কোটি রক্তবাহী নালী আছে এবং কোটি কোটি রক্ত বের হওয়ার নালী আছে। কোটি কোটি শুয়ার প্রত্যেকটি একটি বিরাট হেড অফিস যেখানে অনবরত অজস্র অলক্ষ্য কর্মচারীরা কাজে রত থাকে, মানুষকে চলশক্তি দান করে, অথচ আমরা অনুধাবন করতে পারিনে, চারটা খাবার পেটে ঢুকিয়ে আস্তে কাজে আপন মনে রত থাকি। **দেহের বিভিন্ন অংশে কত কোটি কোটি কর্মচারী যে কাজ করে যায় তারা কিন্তু অবৈতনিক, কোন মাইনে চায় না। তারা শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদেরকে খাটিয়ে আমরা মুখে কি বলি, আর কি কাজ করি তাই অবলোকন করে।**

কোটি কোটি শুয়া থেকে রক্তধারা একটা প্রধান শিরা (Portal vein) দিয়ে যকৃতে (Liver) গিয়ে মিশেছে। একটা পূর্ণ বয়স্ক লোকের যকৃতের ওজন প্রায় তিন পাউণ্ডের কিছু কম। দেহের প্রায় ডান পাশে মধ্যচ্ছদার নীচে যকৃতটি এমন অদ্ভুত এক যন্ত্র যার কার্যাবলী অসাধারণ এবং অধিকাংশ কাজই যার অবোধ্য। যকৃত প্রায় পঁচাত্তরটি বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন করে। বিজ্ঞানীরা বলেন, যকৃত কেমন করে তার দুর্বোধ্য কাজগুলো করে আজও তা কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। যকৃত বিশেষ ধরনের এনজাইম সৃষ্টি করে, ক্ষয় প্রাপ্ত রক্ত কণাকে ধ্বংস করে, রক্ত জমাটকারী পদার্থগুলো সৃষ্টি করে। শ্বেতসার ও চিনি থেকে গ্লুকোজ সংগ্রহ করে, গ্লাইকোজেন (Glycogen) নামে অন্য শ্বেতসারে পরিণত করে সঞ্চয় করে রাখে, প্রয়োজনবোধে গ্লাইকোজেনকে আবার গ্লুকোজে পরিণত করে তন্তুতে রক্তধারায় মিশিয়ে পাঠিয়ে দেয়, পিত্তকোষকে

(Gallbladder) পিত্তপাচক রস তৈরি করে বন্ধুর কাজ করে, আরও কত কাজ যে করে বিজ্ঞানীরা আজও এর অবোধ্য কাজগুলো সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন।

ভাববার কথা

প্রথমতঃ খাদ্য গেলার পর খাদ্য নালীর পেশীগুলো খাদ্যকে ঠেলে ঠেলে পাকস্থলীর দিকে নিয়ে যায়। পাকস্থলীতে খাদ্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের গ্রন্থিগুলো সজাগ হয়ে ওঠে। তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গ্রন্থি দিয়ে বেড়াজালের মত ছাওয়া পাকস্থলী। এগুলোর ভিতরে আবার এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, প্রতি গ্রন্থি থেকে লালা বা রস বের হয়ে খাদ্যকে তরল এবং দ্রবণ করে হজমের উপযোগী করে তোলে। পাকস্থলীর ভিতরে খাবারের পরে যে তুমুল কান্ড হতে থাকে তাতে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেছে, বাইরে থেকে কিছুই টের পাওয়া যায় না। এখন কথা হ'ল, তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গ্রন্থি এমন কায়দায় জালকের মত সৃষ্টি করা হয়েছে যেটা কোন শক্তিশালী চিন্তাশীল মাথার পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়, এদের ভিতরে এনজাইম বা হজমী রসও কায়দা করে সুপ্ত রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ পাইলোরাস বা খালাসী, পাকস্থলীর এক কোণে বসে অবলোকন করছে, কখন পাকস্থলীর ঢেকিতে খাদ্যগুলো গুড়ো গুড়ো হয়ে প্রায় তরল পিন্ডতে পরিণত হবে, অমনি সে পাকস্থলীকে নিষেধ করে বলবে আর নড়াচড়া করো না। তোমার কাজ শেষ, এখন বিশ্রাম নাও। এই বলে সে আস্তে তার মুখের ঢাকনা খুলে খাদ্যকে বের করে মাল খালাসের মত খালাস করে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে খালাস হবার পথটা আবার সে আগলিয়ে বসে থাকবে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে। **পাইলোরাস হচ্ছে একটা প্রাণহীন, মাথাহীন, বুদ্ধিহীন অবোধ জিনিষ তাকে মাল খালাসের মানে– খাদ্য কখন জীর্ণ হয় আর না হয় এ বুদ্ধি কে গুছিয়ে দেয়? এখানে তো মানুষের মাথার কোন বুদ্ধিই খাটে না? এটা কি খুবই ভাববার কথা নয়? অবশ্য মোটা সুতায় চিকন সেলাই সম্ভব নয় এতো আগেই বলা হয়েছে।**

এরপর আসে ক্ষুদ্র অন্ত্রের কথা। ক্ষুদ্র অন্ত্রটা বিশ ফুট লম্বা। এই এত বড় একটা লম্বা নল কি করে এত অল্প স্থানে গুঁজে রইল? একটা বিশ ফুট মোটা দড়ি গুছিয়ে তাকে তুলে রাখতে নিশ্চয় একটা মানুষের দরকার হবে। কিন্তু বিশ ফুট লম্বা একটা মোটা দড়ি একা একা কেমন করে এপাশ ওপাশ ভাজ হয়ে পরিপাটি হয়ে একা একা গুছিয়ে রইল, এখানে কারুরই কিছুই করার দরকার হল না? শুধু গুছিয়েই শেষ হয়নি। একটা দড়ি পাকাতে হলে কোষ্টার পর কোষ্টা পাট তাতে দিতে হয়। তবে না রশিটি পাটের রশি হয়। অন্ত্রটি কি দিয়ে তৈরি? তার চারদিকের দেয়ালের ভেতরে রয়েছে কোটি কোটি

ভিলি বা শুড় বা শুয়া, এগুলো আঙ্গুলের মত। এদের ভিতরে যখন অর্দ্ধ তরল খাদ্য ঢোকে তখন কোটি কোটি শুয়া সামনে পেছনে উপরে নীচে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলা যায় নাচতে শুরু করে এবং এই কোটি কোটি শুয়ার প্রত্যেকটিতে একটি করে রক্ত যাবার পথ, অন্যটি রক্ত বের হবার পথ আছে অর্থাৎ যত কোটি শুয়া তার ডবল কোটি পথ। এতগুলো পথ কিভাবে যে একে বেঁকে গেছে, তা দেখলে জ্ঞানে তাক লেগে যায়। শুয়াগুলো এভাবে খাদ্য থেকে সার ছেকে দেহে দেয়।

না নাড়ালে জড় পদার্থ নড়ে না। বিজ্ঞানীরা বলেন, পথ তৈরি করে না দিলে পথ একা একা হয় না। এই কোটি কোটি শুয়া কে নাড়ায়? কে নাচায় অলক্ষ্যে থেকে? কোন প্রকৌশলীরই কি দরকার হয়নি? কোন মাথাই কি এর পেছনে পরিকল্পনা করেনি? কোন বিবেকই কি এর পেছনে নেই? তাই এসব সৃষ্টিকারী মহা পরিকল্পনাকারী মহাপ্রকৌশলী বলেন, "মানুষ কেমন করে বিবেচনা কর? তোমাদের কি কোন বিবেক নেই? তবু কি তোমরা আমাকে অস্বীকার করবে?"

দেহ চলে কেমন করে

গোটা মানব দেহটা মাংসপেশী, অস্থি ও ত্বক দিয়ে আবৃত। মানব কংকালটা হাড়ের সমষ্টি এবং হাড়গুলো অস্থি সংযোগ ও অস্থি বন্ধনী দিয়ে সংযুক্ত। মাংস পেশীগুলো তাদেরকে মজবুত করে বেঁধে রেখেছে। মানব দেহের সমস্ত পেশীগুলোর ওজন দেহের সমস্ত হাড়ের ওজনের চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। দেহে দু'শোর বেশী পেশী রয়েছে। পেশীগুলো নমনীয়, সংকুচিত বা সম্প্রসারিত হতে পারে। প্রয়োজনবোধে দেহ নড়াচড়া করার সময় পেশীগুলো নড়াচড়া করে দেহের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। স্রষ্টার আশ্চর্য কৌশল চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। আমাদের সারা দেহ জুড়ে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকারের পশম আছে। এগুলো এত সূক্ষ্ম যে নজরে পড়ে না। এগুলো চামড়ার নীচের ছোট গোলাকার মূল থেকে জন্মে। এ পশম বা লোমের পাশে রয়েছে একটি করে ক্ষুদ্র পেশী। শীতের দিনে বা ঠান্ডা লাগলে এ লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে এবং এ সময় ত্বকের নীচটা ফেঁপে ওঠে এবং শীতের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। প্রতিটি সূক্ষ্ম লোমের কাছে একটি স্নায়ু প্রান্ত আছে। ওটা মানুষের অনুভূতিকে সজাগ থাকতে সাহায্য করে, কোন পোকা-মাকড় বা তেমন কোন ক্ষুদ্র জিনিস দেহের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে এই লোমগুলোর কাজ ব্যাহত হয় এবং স্পর্শ কেন্দ্রগুলো টের পায়, তখন মানুষ দেহে একটি অনুভূতি অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোকা-মাকড় ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে।

স্রষ্টার আরেকটি কুদরত হল আঙ্গুল, তার স্পর্শ কাতরতা এবং ছাপ। খালি চোখে আমরা সাধারণত আঙ্গুলের মাথার একটি মোটা চামড়া দিয়ে ছাওয়া দেখি, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, আঙ্গুলে আসলে দু'টো ছাপ রয়েছে, দুটো ত্বক সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু একটি অপরটির সঙ্গে এমনভাবে লেগে আছে যে, দু'টো মিলে একটি ত্বক বলে মনে হয়। ওপরের ত্বকটিকে এপিডারমিস (Epidermis) বা ওপরের পাতলা স্তর বলা হয়। নিচের ত্বকটিকে এন্ড্রো ডারমিস (Endo Dermis) বা নিচের পুরু স্তর বলা হয়। উপরের পাতলা ত্বকটি আসলে নীচের আসল ত্বকটির হালকা একটি সংরক্ষক ত্বক বা আবরণ। নীচেকার আসল ত্বকেই রয়েছে স্নায়ু বা রক্তনালী। কোন সময় একটা আচড় লাগলে বেশী ব্যথা পাওয়া যায় না অথচ একটা সাদা মত দাগ হয়। ওটা আসলে উপরের হালকা ত্বকে লেগে ওরকম হয়। ওর কোষগুলো মরে ওরকম দাগের সৃষ্টি করে এপিডারমিস, জীবাণু এবং আর্দ্রতা থেকে শরীরকে রক্ষা করে থাকে।

হাতের আঙ্গুলগুলো নানা ধরনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় আবৃত। এই অসংখ্য রেখা আঁকি-

কুকি হয়ে আঙ্গুল ছেয়ে আছে। এগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল। এসব রেখার কারণে আমরা যে কোন জিনিষে হাত দিলে তার সম্বন্ধে চট করে একটা অনুভূতি পেয়ে বলতে পারি, এটা কি ধরনের জিনিষ। আঙ্গুলের ছাপ একটা অদ্ভুত সৃষ্টি। একটা বহু উঁচু পর্বত শ্রেণীর অসংখ্য উঁচু চূড়ায় গভীর উপত্যকা থাকলে পর্বতটাকে যেমন দেখা যাবে, আঙ্গুলের ছাপও দেখতে তেমনি। এটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিষ্কার ধরা পড়ে। ওপরের পাতলা ত্বক দু'টো একই রেখায় মিলিত হয়েছে। এটাকেই পর্বত শ্রেণীর মত দেখা যায় এবং এটাই আঙ্গুলের ছাপ সৃষ্টি করে। আঙ্গুলের ছাপটি এমন অভিনব এবং বিচিত্র যে, বিশ্বের দু'জন মানুষের আঙ্গুলের ছাপ এক রকম হয় না। এমনকি অনেক চেষ্টা করে আঙ্গুলের ছাপ ঘষে-মেজে তুলে ফেলতে চেষ্টা করলেও একে তুলে নির্মূল করা যায় না। অস্ত্রপচার করে তুলে ফেললেও আবার যখন চামড়া গজিয়ে ওঠবে, ঐ একই রকম হবে।

ভাববার কথা

বিশ্বের একটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপ অন্য মানুষের ছাপের সঙ্গে মেলে না। এ কথাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। মানুষ জন্মগতভাবেই আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে মার পেট থেকে বের হয়। কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি ধরনের আঙ্গুলের ছাপ। এই বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ছাপ সৃষ্টি হতে হলে আঙ্গুল পরীক্ষা করে দেখে আঙ্গুলগুলো বিভিন্ন রকম করে সৃষ্টি করা দরকার। তাছাড়া প্রতিটি আঙ্গুলের ছাপে ব্যতিক্রম করা মোটেই সম্ভবপর হত না। একই স্রষ্টা যদি সৃষ্টি না করতেন এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আঙ্গুল মাতৃগর্ভে পরীক্ষা করে না দেখে সৃষ্টি করতেন, তাবে আন্দাজের ওপর নির্ভর করে না দেখে সৃষ্টি করলে নিশ্চয়ই যে দুটো আঙ্গুলের ছাপ, অথবা একাধিক আঙ্গুলের ছাপ একই রকম হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমেরিকায় রাত বারটার সময় একজন মায়ের গর্ভে একটি শিশুর আঙ্গুলের ছাপ সৃষ্টি করার সময় হয়েছে, ঠিক একই সময় চীন দেশের একটি শিশুর মাতৃগর্ভে আঙ্গুলের ছাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়েছে, একই সময়ে বাংলাদেশের এক মহিলার গর্ভে একটি শিশুর আঙ্গুল সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়েছে, এভাবে হাজার হাজার বিভিন্ন দূরত্বের দেশে একই সময়ে লাখ লাখ নারীর গর্ভে শিশুর আঙ্গুলের ছাপ সৃষ্টি বিভিন্ন রকম করার প্রয়োজন পড়েছে। এই সর্বক্ষেত্রে একই সময়ে একই সৃষ্টিকারী একই সময় চোখে দেখে দেখে পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের আঙ্গুল সৃষ্টি যদি করতে না পারতেন, তবে কেমন করে এক আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের সঙ্গে পার্থক্য হত? নিশ্চয়ই একটার সঙ্গে অন্যটার মিল হয়ে যেত।

অনুরূপভাবে, মানুষের চেহারা আরও একটি অতি ভাবনার ব্যাপার। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের চেহারা কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। কিছু না কিছু বেশি কম থাকে। লক্ষ লক্ষ নারীর মাতৃগর্ভে দেখে শুনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আংগুলই শুধু সৃষ্টি করা

হয়নি, মানুষের চেহারাও অনুরূপভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের চেহারা অবশ্য গরমিল হয়। এছাড়া ভাববার কথা হচ্ছে, মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে কিন্তু তাদের কারুর চেহারা আজকের দুনিয়ার কারুর সঙ্গে মেলে না, এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে ভবিষ্যতে তাদের চেহারাও মিলবেনা। হয়ত এটা আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। তাহলে কথাটা সংক্ষেপে দাঁড়াল এরকমঃ

লাখ লাখ মেয়ে মানুষের লাখ লাখ গর্ভ পরীক্ষা করে দেখে আঙ্গুল ও চেহারা বিভিন্ন রকম করে সৃষ্টি করতে হলে শুধু একজন স্রষ্টার দরকার, একজনই শুধু পারে বিভিন্ন ছবি দেখে বিভিন্ন রকমের ছবি সৃষ্টি করতে। কারণ অনেকে দেখলে এবং অনেকে সৃষ্টি করলে দু'রকম হবেই। অনেকের এই কোটি কোটি মানুষ ছবি একটার সঙ্গে আর একটা মিল হবেই। হাজার ইঞ্জিনিয়ার যদি একই বিল্ডিং-এর নক্শাা করে তার অধিকাংশ নক্সাই একটার সঙ্গে একটা মিল হয়ে যাবে, এটা খুব মোটা কথা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্রষ্টা মাত্র একজনই এবং বিভিন্ন দূরত্বের বিভিন্ন গর্ভে একই সময় অতি অন্ধকার মাতৃ কবরে বিভিন্ন রকমের চেহারা এবং আঙ্গুলের ছাপ যিনি অঙ্কিত করেন, **তিনি একজন যা-তা পাত্র নন। তার এমন অপূর্ব মহাক্ষমতা কল্পনাও করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য**। তাই তিনি বলেন, আমি সমস্ত বস্তুর ওপরে সর্বশক্তিমান এবং আমিই মাতৃগর্ভে মানুষের আকৃতি ও গঠনকে নির্ধারিত করেছি। বিশ্বে কেউ কোন দিন কোন কালেও দাবী করতে পারে না, বিশ্বের সমস্ত নারীর গর্ভের সন্তানের আকৃতি ও গঠন আমিই নির্ধারিত করেছি। মহাস্রষ্টা এবং মহা প্রকৌশলী আল্লাহ্ এতই পরাক্রমশালী এবং ক্ষমতাবান যে, মানুষের ধারণার বাইরে। তবু পিট পিটে ছারপোকার মত ক্ষুদে মানুষ তাকে অস্বীকার করতে কুণ্ঠবোধ করে না। তাই আল্লাহ্ মানুষের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে বলেছেন, 'ওয়াল তানযুর নাফসু-ম্মা কাদ্দামাত লিগাদ' (আল-কু'রআন)–অর্থাৎ আগামীকালের জন্য কি হাতে আছে কৈফিয়ত দেবার জন্য, তা ভেবে দেখে মাটির কবরে পা নামিয়ে দিও।

কিসে জীবন বাঁচিয়ে রাখে

প্রতি মিনিটে ষোলবার আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়ি। রক্তে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় বলে এ রকম করতে হয়। নিঃশ্বাস দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করি। পরিশ্রমে অধিক অক্সিজেন ক্ষয় হয়, এজন্য ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়। মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে ফুসফুসের ক্ষতি হয় কারণ নাকের ভিতরে রয়েছে ক্ষুদ্র রক্তনালী। সেগুলো ঠান্ডায় রক্ত সঞ্চারিত করে ফুলে উঠে। নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়ে যাবার সময় দেহ থেকে তাপপ্রাপ্ত হয়, ফলে ফুসফুস নিরাপদে থাকে। ক্ষুদ্র তন্ত্র দিয়ে বায়ু পথগুলো আবৃত। এক প্রকার আঁঠাল জিনিভ একে ভিজিয়ে রাখে। ধূলিকণা ও রোগ-ব্যাধির জীবাণু থেকে নিঃশ্বাসকে রক্ষা করে। নাকের গোড়ার দিকে ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় রয়েছে। নাকের ভিতরে অনেক খাঁজ আছে যার মাধ্যমে এবং ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বরাবর মগজে ঘ্রাণ চলে যেতে পারে। নাক দিয়ে যখন বায়ু প্রবেশ করে, মুখের পেছন দিকে রয়েছে নরম তন্তুরাজি যেগুলো পানি জাতীয় জিনিসে ভর্তি, তখন এগুলো সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুকে আটকে নষ্ট করে।

গলার উপরিভাগে রয়েছে স্বরকুঠরী। এটার ভিতরে স্বররজ্জু রয়েছে। ওগুলো ইংরেজী 'ভি' 'V' অক্ষরের মত দুটো পর্দার মত। এই অক্ষরের মত জিনিষের ভিতর যখন বায়ু প্রবেশ করে একে চালনা করে তখন মানুষের গলার স্বর বের হয় বা মানুষ কথা বলতে পারে। নারী ও শিশুদের বেলায় স্বরের তারতম্য হয়। তাদের স্বর রজ্জু খাটো, এজন্য তাদের স্বর পুরুষের চেয়ে চড়া, পুরুষের স্বররজ্জু লম্বা, এজন্য তাদের স্বর ভারী ও মোটা।

বায়ুনালী লম্বায় প্রায় চার ইঞ্চি। শ্বাসনালী দু'ভাবে ভাগ হয়ে বুকের ভিতর দিয়ে ফুসফুসে গিয়ে ঠেকেছে। দু'ভাগ হবার প্রথমে ইংরেজী ওয়াই (Y) অক্ষরটি উল্টিয়ে লিখলে যেমন হয় তেমন হয়েছে। যেমন Y এরা দু'ভাগ হয়ে ফুসফুসে গিয়েছে। ফুস-ফুসে এরা ক্রমাগত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ হয়েছে। এদেরকে ব্রংকিয়ল (Bronchiole) বলা হয়। ব্রংকিয়ল বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ হয়ে এরা সারা ফুসফুস জালের মত ছেয়েছে এই বায়ু থলের সংখ্যা গণনা করা এক রকম অসম্ভব। প্রায় একশো কোটির মত প্রতিটি থলের চারদিক ঘিরে আছে অতি ক্ষুদ্র রক্ত নালীর বেড়া। এগুলোকে জালক বলা হয়। জালকের বেড়াটা এক স্তর জীবকোষ মাত্র। হৃৎপিন্ডের দু'পাশে দু'টো ফুসফুস অবস্থান করছে। প্রতিটি ফুসফুসে একশো কোটি বায়ুবাহী নালী আছে এবং একশো কোটি বায়ুবাহী থলে আছে।

বায়ুথলেগুলো রক্তের নদীতে ডুবে আছে অথচ এক আশ্চর্য উপায়ে এদের ভিতরে রক্ত ঢুকতে পারে না। যদি রক্তে এসব বায়ুনালী পূর্ণ হয়ে যেত তবে মানুষ দম বন্ধ হয়ে মরে যেত। শ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে একশো কোটি বায়ুবাহী নালী দিয়ে বায়ু একশো কোটি বায়ুথলেতে প্রবেশ করে। এভাবে **দুটো ফুসফুসে এককোটা নিঃশ্বাস দুশো কোটি ভাগ হয়ে দু'টো ফুসফুসে গিয়ে অক্সিজেন ছেঁকে রক্তে মিশিয়ে দেহে রক্ত চলাচল ঠিক রাখে**। বায়ুথলেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এগুলো নিঃশ্বাস থেকে অক্সিজেন ছেঁকে রক্তে মিশিয়ে দেয়। সেই রক্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে হৃৎপিন্ডে যায় এবং এতে করে সারাদেহ ও হৃৎপিন্ড তাজা থাকে। বায়ুতে অক্সিজেন ছেঁকে না দিলে মানুষের রক্তের কণিকাগুলো একত্রিত হয়ে রক্ত জমাট বেঁধে যেত। হৃৎপিন্ডের চারিটি কোঠায় এই জমাট রক্ত চালিত হতে পারত না। চোখের পলকে মানুষের মৃত্যু হয়ে যেত। নিঃশ্বাসের বায়ু থেকে অক্সিজেন ছেঁকে বায়ুথলে কিভাবে রক্তে অক্সিজেন ছাড়ে সেটা বিবেচনার বিষয়। হিমোগ্লোবিন নামে এক প্রকার লৌহযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ এটা সম্ভব করেছে। বায়ুথলে থেকে যখন অক্সিজেন রক্তে ঢোকে, রক্ত থেকে তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামে এক প্রকার পরিত্যাজ্য জিনিষ প্রশ্বাসের সঙ্গে বের হয়ে যায়। আবার নতুন করে অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে বায়ুথলে পূর্ণ করে, আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রশ্বাসের সঙ্গে বের হয়ে আসে। এভাবেই অবিরাম চলে চলে মানুষ বেঁচে থাকে। ব্যাপারটা এমন জটিল যে, ভাবতেও অবাক হতে হয়। রক্তের নদীতে ডুবে থাকে বায়ুথলে। বায়ুথলে থেকে অতি সূক্ষ্ম দ্বার দিয়ে ছেঁকে অক্সিজেন রক্তের মধ্যে গিয়ে মিশে এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কিভাবে যে বায়ুথলেতে ঢোকে অথচ রক্ত ঢোকে না, এটা স্রষ্টার এক অপূর্ব কৌশল।

বহু কোটি বায়ু থলে রয়েছে ফুসফুসে, এজন্য এটা খুব হালকা। ফুসফুস বায়ু থলে থেকে বায়ু গ্রহণ করে, এ কারণে মধ্যচ্ছদার মাংসপেশী সংকুচিত হয়, পাঁজরের পেশী পাঁজরগুলোকে ওপরে টেনে তোলে, ছাতি হয় বড়, ফুসফুস দুটোও যায় বিস্তৃত হয়ে এবং ফুসফুসের ভিতরে বায়ু থলেগুলোও ফেঁপে যায়, তখন ফুসফুসের বেড়ে যাওয়া জায়গা ভর্তি করতে বায়ু ভিতরে ঢোকে। প্রশ্বাসের ঠিক এর উল্টোটা ঘটে। এ যেন কর্মকারের হাপড়ের মত।

আরেকটি অদ্ভুত যন্ত্র-বৃক্ক বা কিড্‌নি

বৃক্ক বা কিড্‌নি দেখতে শিমদানার মত। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের বৃক্কের দৈর্ঘ্য ৪জত(১,২) ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২জত(১,২) ইঞ্চি এবং এটি ১জত(১,২) ইঞ্চি পুরুত্ব। চর্বির থানা তাদেরকে দেহের সাথে এঁটে রেখেছে। পাঁজরের নীচেই এরা রয়েছে। পাঁজর এবং চর্বির থানা এদেরকে ধরে রেখেছে। মধ্যচ্ছাদার ঠিক নীচেই দুপাশে দুটো কিড্‌নি রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, একটি কিড্‌নি হলেও একটা মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে। এমন কি বিজ্ঞানীরা বলেন, আধখানা কিড্‌নি হলেও একটি মানুষ বাঁচতে পারে।

দেহ জীবন্ত থাকাকালীন অক্সিজেন, পানি ও খাদ্যের দরকার। কিন্তু এসব থেকে পরিত্যাজ্য অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস যা দেহের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর যেমন– ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড এবং রক্তে অতিরিক্ত পানি ঢুকে রক্তকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে না যায়, সেজন্যও ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ শরীর থেকে বের হওয়ারও দরকার। রক্তে কি পরিমাণ পানীয় পদার্থ থাকতে হবে, কি পরিমাণ আবর্জনা এবং পানি বের করে দিলে দেহ ঠিক থাকবে বৃক্কদ্বয় তা নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রতিটি বৃক্ক মুত্রগ্রন্থি দিয়ে তৈরী। প্রতি বৃক্কে কমপক্ষে দশ লক্ষ মুত্রগ্রন্থি আছে। প্রতি বৃক্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি করে রক্তবাহী নল আছে। একটি বড় শিরা যা বিশুদ্ধ রক্ত বয়ে নেয়, দ্বিতীয়টি বড় ধমনী যেটি রক্তকে পরিশোধন করতে নেয় এবং তৃতীয়টি হচ্ছে মূত্রনালী যা মূত্রাশয়ে মূত্রকে চালিয়ে নেয়। সহজ কথায় বৃক্ক দু'টি কন্ট্রোলারের কাজ করে।

ভাববার কথা

কে বৃক্ককে বলে দেয়, এই পরিমাণ পানি দেহে রক্ষা করতে হবে, আর ইউরিক এসিড, ইউরিয়া ইত্যাদি জঞ্জাল দেহ থেকে বের করে দিতে হবে? বিশেষ করে রক্তের পানীয় অংশ নিয়ন্ত্রণ বৃক্কের একটা প্রধান কাজ। বৃক্ক হচ্ছে একটি অবোধ যন্ত্র যার কোন বুদ্ধি নেই, মাপ-জোপ জ্ঞান নেই। কে তাকে নির্দেশ দেয় এই পরিমাণ পানি রক্তে রক্ষা কর বা এই পরিমাণ মূত্রনালীতে ছেড়ে দাও? গাড়ীর তেলের ট্যাংক কোনদিন গাড়ীর ড্রাইভারকে ডেকে বলে না, এই পরিমাণ তেল আছে বা নেই। তেলের মিটার উঠে, তা দেখে ড্রাইভার তেল সম্বন্ধে আঁচ করে নেয়। বৃক্কের কি কোন রক্ত মাপার মিটার আছে অথবা কে তাকে নিখুঁত মাপ-জোপ শেখাল?

দৈনিক এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত কোটি রক্ত কণিকা ধ্বংস করে কে?

পিলে (Spleen) একটা আশ্চর্য যন্ত্র। হাতের আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করলে যা হয় একটা পিলে প্রায় তত বড়। পাকস্থলীর পেছনে মধ্যচ্ছদার নীচে এবং বাম বৃক্কের একটুখানি ওপরে পিলের অবস্থান। পিলের রং গাঢ় লাল। পিলে একটা রক্তের আধার। এতে অনেক রক্ত জমা থাকতে পারে এবং রিজার্ভ হিসেবে সে রক্ত জমা রাখে। কোন জায়গা কেটে গেলে বা জখম হলে পিলেই তৎক্ষণাৎ রক্ত সরবরাহ করে। পিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রক্ত কণাকে ধ্বংস করা। রক্তের মূল উপাদান রক্তকণা। পিলে কেন একে ধ্বংস করে তা জানা যায় না। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রায় প্রতি মাসে অর্থাৎ তিরিশ দিন পর পর রক্ত কণিকাগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আসে। দেহে পুরনো জিনিষ থাকা স্রষ্টা বোধহয় ভাল মনে করেনি। এ কারণে পিলে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে সজাগ থাকে। ভেবে খুবই অবাক হতে হয় যে, প্রতি সেকেণ্ডে পিলে ১ কোটি রক্ত কণাকে ধ্বংস করে, যকৃতও তাই করে। অবশ্য এগুলো ক্ষয় পাওয়া রক্তকণা। পিলে ও যকৃত মিলে প্রতি সেকেন্ডে ৩ কোটি ক্ষয় পাওয়া রক্ত কণাকে ধ্বংস করে। অবশ্য প্রতি সেকেন্ডে আবার ১ কোটি নতুন লোহিত কণা হাড়ের মজ্জার ভিতরে এবং অন্যান্য যন্ত্র বিশেষে সৃষ্টি হয়। ভাংগা-গড়ার কি অপূর্ব লীলা চলে মানবদেহে নীরবে নীরবে। তাই বলা হয়, ভাঙ্গা-গড়ার ভারসাম্যের নামই স্বাস্থ্য। (Health is a balance between destruction and repair)। **প্রতি সেকেন্ডে ২ কোটি রক্ত কণিকা ধ্বংস এবং সৃষ্টি হতে কি তুমুল কান্ড কারখানাই না দেহের ভিতরে ঘটতে থাকে! মহাস্রষ্টা ছাড়া কে পারে এমন কাজ সম্পন্ন করতে?** তাই–

ভাংগা-গড়ার এই যে লীলা
ক্ষণিকের এই ভবে,
ভাংগবে শুধু গড়বে না আর
তখন কেমন হবে।
সেদিন আমায় আমি বলে
চিনবে না তো কেউ,
অপার সাগর বক্ষে যেমন
থামব একটা ঢেউ।

প্রতি সেকেন্ডে এক কোটি রক্তকণা ধ্বংস হলে দৈনিক ধ্বংসের হার হয়– যকৃত এবং প্লীহা উভয়ে দৈনিক যে রক্ত কণিকা ধ্বংস করে তার পরিমাণ হয়- এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত কোটি। এভাবে প্রতি বছরে তারা উভয়ে ধ্বংস করে

৬,৩০,৭২০০০,০০০০০০০ বা ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার কোটি রক্ত কণিকা। আবার অনুরূপ কণিকা সৃষ্টি হয়। এভাবে চলতে চলতে হয়ত একদিন আর নতুন রক্ত কণিকা সৃষ্টি হবে না এবং সেই দিনই মানুষের জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে।

বিস্ময়কর শব্দ যন্ত্র

একটা শব্দ হলেই চট করে আমরা তা শুনতে পাই। এটা কেমন করে সম্ভব হয়? স্রষ্টার অপূর্ব কৌশল হল, কান। একটা রেডিওর ভিতর কত প্রকারের কলকব্জা রয়েছে, কথা ধরার জন্য। কিন্তু কানের ভিতরে সামান্য দু'চারটে যন্ত্রের এমন কলা-কৌশল আছে যে তাতেই শব্দ, গান, কথা ধরা পড়ে। কানের তিনটি ভাগ আছে-বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ এবং অন্তঃকর্ণ। কানের বাইরে চোং-এর মত একটা মাংসের আঁকা-বাকা দেয়াল আছে। ওগুলো বাতাস থেকে শব্দ তরঙ্গ আকড়ে ধরে কানের ভিতরের ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে দেয়। এ চোং-এর মত জিনিষটাকে কর্ণছত্র বলে (Pinna)। শ্রবণ পথ থেকে কানের ভিতরের দিকে যে ক্ষুদ্র পথটি রয়েছে তাকে বহিঃকর্ণ বলে। শ্রবণ পথটি প্রায় ইঞ্চিখানেক দূরে ঢুকতেই একটা পাতলা পর্দায় ঠেকেছে। এ পর্দায় (Drum) বাইরের শব্দ কর্ণ রন্ধ্র দিয়ে এসে ঠেকে এবং পর্দায় কম্পন (Vibration) জাগায়। পর্দার অপর পাশে একটা ছোট গর্তের মত আছে, এই গর্তটাই হচ্ছে মধ্যকর্ণ। তিনটি ক্ষুদ্র হাড় দিয়ে মধ্যকর্ণ গঠিত। তাদের নাম যথাক্রমে হাতুড়ি, নেহাই ও রেকাব। শব্দ কানের পর্দা থেকে ভিতরে প্রবেশ করার কালে তিনটি হাড়ই সমবেতভাবে কাজে লেগে যায়। শব্দ কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দায় কম্পন জাগায়। হাতুড়ির হাতলটির গোড়া পর্দার সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় এটি শব্দকে নেহাইতে পাঠিয়ে দেয়। নেহাই সরাসরি শব্দটাকে রেকাবে পাঠিয়ে দেয়। রেকাবে যখন শব্দ তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হয়, তখন শব্দটি ককলিয়ার (Cochlea) পেরিলিম্ফ (Perilymph) নামক এক প্রকার তরল জাতীয় জিনিসের ভিতরে দিয়ে অতিক্রম করে তরল তরঙ্গে পরিণত হয়। কচ্লী ভারী অদ্ভুত জিনিস। ককলিয়া বা কচ্লী অর্থ শামুকের পেচওয়ালা জিনিসটিই এই কচ্লী। কচ্লীর সঙ্গে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলো সংযোজিত আছে এবং স্নায়ু কোষগুলো শব্দকে সরাসরি মগজে পাঠিয়ে দিতে তৈয়ার হয়ে থাকে। শব্দের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য অন্তঃকর্ণে আরেকটি যন্ত্র আছে। অর্ধবৃত্তাকার তিনটি নালী অন্তকর্ণে রয়েছে। একটুখানি নড়াচড়া পেলেই ঐ থলের পানি নড়ে ওঠে এবং মস্তিষ্কগামী স্নায়ুপ্রান্তকে স্পর্শ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে খবরটা মাথায় পাঠিয়ে দেয়। মগজ তখন স্নায়ুপেশীকে ভারসাম্য বজায় রাখতে আয়ত্ত্বাধীন করে দেয় এবং আশ্চর্যভাবে চোখের পলকে এ কাজগুলো সম্ভব হয়। একটা শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের নিমেষে এতগুলো কাজ সম্ভব হয় এবং শুধু তাই-না মগজ শব্দটা শুধু অনুধাবনই করে না, বিচার বিবেচনা করেও দেখে এ শব্দটা কি ভাল না মন্দ? সাপের শিস, না বাঘের ডাক, না গালি। চোখের পলকে এত কাজ গুছিয়ে ওঠে যে, ভাবতেও অবাক লাগে। বাইরে থেকে এতগুলো দুরূহ কাজের কিছুই আমরা অনুধাবন করতে পারি না। মহাস্রষ্টার অপূর্ব লীলা

মানুষের ভাবনা-চিন্তার বাইরে। তাই–

কানের মাঝে কানটি পাতি,
কে শোনায়রে দিবস-রাতি।
কে খেলিছে নিরব খেলা সকল ঘরে বসে,
বলবে কখন ওঠো এখন হিসাব দেখাও এসে।

চোখের দেখাই কি দেখা?

ক্যামেরার মতই চোখ দুটো কাজ করে। চোখের কয়েকটি অংশ আছে। চোখের সামনে ফোলা জায়গাটাকে অচ্ছোদ পটল (Cornea) বলে। আইরিস অচ্ছোদ পটলের ঠিক পেছ্নেই। এটা একটা হালকা থালার মত। আইরিস বা কর্ণীকার ওপরেই চোখের রং নির্ভর করে। বিভিন্ন রং-এর চোখ হতে পারে। বাদামী, নীল, লালচে, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি। কর্ণীকার একটা কেন্দ্র আছে। এখানে একটা গর্তের মত রয়েছে কর্ণীকার অপর পার্শ্বটা গাঁঢ় লাল আভায় পূর্ণ। কর্ণীকার কেন্দ্রের এই গোলাকার গর্তকে চোখের মনি বলে (Pupill)। কতগুলো পেশী দু'ভাগে সমবেতভাবে মনির আকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বেশী আলোতে পেশীগুলো মনিকে ছোট করে যাতে তীব্র আলো চোখের ক্ষতি করতে না পারে এবং স্তিমিত আলোতে পেশীগুলো গর্তটাকে প্রসারিত করে যাতে করে আলো মনিতে বেশী ঢুকে ভাল করে দেখার সুযোগ পায়। মনির ঠিক পেছনে স্বচ্ছ এবং ছোট থালার মত একটি জিনিস রয়েছে যাকে পরকলা (Lens) বলে। এর মাঝখানে পুরু আর প্রান্তগুলো হাল্কা। একটা পেশী এর চারিদিক বেষ্টন করে আছে। পেশী বেষ্টনী পরকলাকে কিছু মোটা আর ক্ষুদ্রাকার করতে পারে যাতে নিকটের বস্তুকে বড় দেখা যায়। পেশীটি আবার শিথিল হলে দূরে বস্তুকে অধিক স্পষ্ট করে দেখা যায়। একোয়াস হিউমর (Aqeous humor) নামে এক প্রকার পানি জাতীয় পদার্থ রয়েছে অচ্ছোদপট ও পরকলার মধ্যবর্তী স্থানে। ভিটরিয়াস হিউমর (Vetreous humor) নামক নরম জেলী জাতীয় পদার্থ দিয়ে চোখের অবশিষ্টাংশ ভর্তি হয়ে আছে।

চোখের পেছন দিকে রয়েছে আর একটি অদ্ভুত জিনিস, যাকে রেটিনা (Retena) বলা হয়। এই রেটিনা বা অক্ষিপট একটা পাতলা ঝিল্লি বা পর্দার মত। এর সঙ্গে জুড়ে আছে আলোর স্পর্শকাতর স্নায়ুপ্রান্ত। দু'রকমের স্নায়ুপ্রান্ত রয়েছে। একটি মোচার মত, অন্যটি দেখতে প্রায় রডের মত, রড বা দণ্ডটি অল্প আলোর প্রতি স্পর্শকাতর। মোচাগুলোর সাহায্যেই আমরা বিবিধ রং দেখতে পাই। লেনস বা পরকলা ক্যামেরার লেন্সের মত ছবি ধরে। তারপর সে ছবিটিকে অক্ষিপট বা রেটিনায় প্রতিফলিত করে। দন্ড ও মোচা স্নায়ুতন্ত্র বেয়ে এই প্রতিফলিত ছবি মগজে গিয়ে ওঠে এরপর আমরা দেখতে পাই। কথাটা ভাববার মত। প্রথমে আমাদের চোখে কোন বস্তুর ছবি পড়লে ওটার ছবি কিন্তু উল্টো হয়ে আমাদের চোখে হাজির হয়, পরে রেটিনা থেকে দন্ড ও মোচা দিয়ে মগজে সোজা ও স্বাভাবিক হয়েই মাথায় গিয়ে ধরা পড়ে।

চোখের মনিটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি আয়নার মত। **এই এত ছোট আয়নায় এত বড় আকাশ, এত বড় বটগাছ, গগনচুম্বী অট্টালিকা কেমন করে ঠাঁই হয়? কেমন করে এত দূরের সূর্য, ন'কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য এবং দুনিয়ার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় সূর্য কেমন করে একটু মনির ভিতরে জায়গা হয়।** সমস্ত স্নায়ুতন্তু (Optic Nerve) চোখের দিকে দিয়ে অক্ষিপটে প্রবেশ করে অলক্ষ্যে চোখের কাজ করে যাচ্ছে। এইখানে রয়েছে একটা ব্লাইন্ড স্পটবা অন্ধকার মন্ডল যা আলোর আধার বটে, পরোক্ষ ভাবে। তাই–

ছোট্ট একটি চোখের তারায় সকল ধরা ধরা পড়ে,
আরও কিছু যেত দেখা, দেখতে যদি লক্ষ্য করে।

চোখ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে নাকি চোখে দেখা যায় না। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য হলেও ভাববার মত অনেক রয়েছে এতে। দেখা কেমন, দেখা দেখতে কেন এমন বা অমন দেখায়। দেখার ভিতরে একটা দেখা থেকে যায় যদি কেউ ভাল করে দেখতে জানে। পাতা বাহারের একটি রং ছিটানো রঙ্গিন পাতা, গোলাপের উজ্জ্বল মুখখানি, দোলন চাপার সুরভিমন্ডিত নীরব হাসি, গন্ধরাজের পেলব পাপড়ি, প্রজাপতির পাখা ভরা অলক্ষ্য তুলির কোমল আচড়, শুভ্রা যামিনীর পিয়াল শাখার পাতার মর্মার ধ্বনি, বিশ্বভরা মহাবৈচিত্র্যময় চিত্র কলার ছাপ, বর্ষণ মুখর আকাশভরা মেঘাপ্লুত বিদ্যুৎ ছটা, ময়ূরের পাখা ভরা নিপুণ শিল্পীর নীরব গুঞ্জরণ, সবার ওপরে একজন রূপসী নারীর নীরব চাহনি ভরা আঁখিতারা আর গঠন-গাঠন এসব কি শুধু চোখের দেখাই দেখা? এই দেখার ভিতরে আর কি কোন দেখা নেই? তাইত বলা হয়, দেখা কি শুধু দেখেই শেষ হয়, দেখার সঙ্গে ভাবাবিষ্ট মন মিশলে তবে না সে দেখা দেখতে দেখার মত হয়।

যিনি দেখার জন্য চোখ সৃষ্টি করেছেন, তিনি বলেন, দিয়েছি তোমাদের চক্ষুসমূহ যদি তা মেলে দেখ, দেখবে আমাকে কেমন করে দেখতে পাও। তিনি আরও বলেন, কতইনা নিদর্শন রয়েছে আকাশে, পৃথিবীতে যা দেখে ভাবনা প্রবণ জ্ঞানী লোকেরা আমাকে উপলব্ধি করতে পারে। তা বলে মূঢ় যারা, কুপমন্ডুক একগুয়ে, যারা জ্ঞানান্ধ বিমূঢ়, স্বল্প জ্ঞানী, ক্ষুদে চিন্তাশীল এবং অন্ধ তার্কিক, তারা কোন দিনও আমার নিদর্শন, আমি যে ভাবে দেখতে বলেছি, তা উপলব্ধি করতে পারবে না, নিজেকে অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে আড়াল করে রাখবে। তাই তিনি বলেছেন, "অজায়াল নাল লাইলা লিবাসা" (আল কুর'আন) অর্থাৎ নিরালা নিশীথে অন্ধকারের পরিচ্ছদে নিভৃত হয়ে আমার কাছে এস। তোমার সাথে আমি আলাপ করবো। তুমি বলবে, আমি শুনবো। আমি বলব, তুমি শুনবে।

মন তুমি জান, আমি জানি
আর কেহ নাহি জানে।

স্রষ্টার অপূর্ব কৌশল-জোড়ায় জোড়ায়

মানব দেহে হাড় না থাকলে দাঁড়ান, উঠা, বসা, হাঁটা, বোঝা বহন, নড়াচড়া করা ইত্যাদি কিছুই সম্ভব হত না। মানব দেহের হাড়গুলো চলা, এমন অপূর্ব কায়দায় এবং এত বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মাথা খাটিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা এর গঠন ও কার্যাবলী দেখে হতবাক হয়ে গেছেন। প্রায় ২০৬ খানা বিভিন্ন ধরনের হাড় রয়েছে দেহাভ্যন্তরে। এর কোন কোনটি লম্বা, কোনটি খাটো, কোনটি চেপ্টা, কোনটি গোল, কোনটি ছু'চালো। আরও প্রায় বিশটি হাড় রয়েছে, তাদের ঠিক হাড় বলা চলে না। এগুলো সিসামোইড (Sisamoid) অস্থি। যেমন– হাঁটুর ঢাকনা (Patella)। হাঁটু যাতে স্থানচ্যুত না হয়, নড়াচড়া বা উঠা বসার সময় সেজন্য এ ঢাকনাটি হাঁটুকে স্থিতিস্থাপকভাবে রক্ষা করে। মাতৃগর্ভে শিশু থাকাকালীন শরীর বৃদ্ধির সময় কণ্ঠাস্থি হাড়টি প্রথমে সৃষ্টি হয়। উপাস্থির আকারে মায়ের গর্ভে প্রথম হাড় সৃষ্টি শুরু হয়। উপাস্থির ভিতর ক্যালসিয়াম জড় হয়ে হাড়ের সূচনা করে। অধিকাংশ হাড়ের ভিতরে ফাঁপা ও হলদে মত মজ্জায়পূর্ণ। চামড়ার নীচে হাড়ের সঙ্গে লাগা গোশ্তের শক্ত পেশী আছে। এগুলো হাড়কে এটে রেখেছে।

দেহ বৃদ্ধির সাথে সাথে হাড়ও বাড়ে। মাথার মগজ আটটি হাড় দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে। এ হাড়গুলো ভিন্ন ধরনের। এগুলো চ্যাপটা ও বাকানো। এগুলো দু'পাশ বেশ মজবুত। এর ভিতরে স্পঞ্জের মত হাড়ও আছে। হাড়গুলো অদ্ভুতভাবে জোড়া লাগানো আছে। কোন কোন দু'হাড়ের মাঝামাঝি রয়েছে একটা বল। বল দিয়ে কোন কোনটা জোড়া দেয়া হয়েছে। কোন কোনটা কব্জা দিয়ে জোড়া দেয়া যেমন কনুই ও হাঁটু। এই কব্জা (Ligament) দু'হাড়কে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। অথচ হাড় দু'টো স্থানচ্যুত হয়না। অদ্ভুত শক্তি এই পিচ্ছিল পানি জাতীয় কব্জার। একজন কুলি দু'মণ ওজনের জিনিস মাথায় করে নীচে থেকে হর হর করে ওপরে ওঠে। তখন তার দু'হাটুতে যে ভীষণ চাপ পড়ে এই কব্জায় সেই চাপ কেমন করে সহ্য করে। জিনিসের ওজন ছাড়া দেহেরও তো অনুরূপ ওজন আছে, সেজন্যও কব্জাকে কব্জ করে রাখতে হয়। অনুরূপভাবে, কত কত হাড়ের বল অন্য হাড়ের গর্তের ভিতরে ঢুকে থাকে। একটা ঝিল্লি বা আঠাল পরত তাদেরকে আটকে রাখে। খুব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন হাড়ই কোন হাড়ের সঙ্গে লোহার কব্জার মত, কব্জা বা স্ক্রু-বলটু দিয়ে আটকানো নেই অথচ দেহের এক হাড় অন্য হাড় থেকে এত চোট পেয়েও কেন যে বিচ্যুত বা স্থানচ্যুত হয় না, একমাত্র স্রষ্টাই এর ভেদ বুঝেন।

হাড়গুলোর মধ্যে মেরুদন্ডের হাড় যাকে কশেরুকা (Vertebrae) বলে। এটা সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ভরা। তেত্রিশটি পৃথক পৃথক হাড়ের গাঁথুনি বা মালার নামই হচ্ছে মেরুদন্ড। এর নীচের দিকে পাঁচখানা হাড় ক্রমাগতভাবে ছুঁচাল হয়ে গেছে। মেরুদন্ডের তেত্রিশটি হাড়ের প্রত্যেকটি হাড় বা হাড়ের গাটকে কশেরুকা বলা হয়। প্রতিটি কশেরুকার মাঝামাঝি একটা পিচ্ছিল জাতীয় জিনিস (Ligament) রয়েছে। আরও রয়েছে ক্ষুদ্র অস্থি ও পেশী যা দিয়ে একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত। গর্দানের উর্দ্ধভাগে প্রথম কশেরুকা মাথার ভার বহন করছে। দ্বিতীয়টি এর নড়াচড়ায় সাহায্য করছে। প্রতিটি কশেরুকার ভিতর দিয়ে একটা লম্বা মোটা সাদা সুতার মত রজ্জু আছে, যাকে পৃথক পৃথক তিনটি ঝিল্লি (Membrane) বন্ধনী দিয়ে আটকে রেখেছে। মেরুরজ্জুটি বরাবর মাথার মগজে গিয়ে মিশেছে। মেরুরজ্জুটি একটা টেলিফোনের খুব মোটা তারের মত, যা দেহের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

মেরু রস বা Spinal fluid নামে একটি রস মেরু রজ্জুকে আঁকড়ে রেখে বাইরের বিপদ-আপদ থেকে একে রক্ষা করে। ঝিল্লি, মেরু, রস, পেশী, কব্জা এবং সবার ওপরে কশেরুকার সুদৃঢ় দুর্গ মেরুরজ্জুকে রক্ষা করে না রাখলে, মানুষের দশা কি যে হত তা অনুমান করা যায় না।

মর্মকথা

মানুষ ও হায়ওয়ানার মধ্যে সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে বিশেষ ব্যবধান নেই। আসল ব্যবধান হচ্ছে জ্ঞান এবং বিবেকে। জীবজন্তুর ভাবনা চিন্তা নেই, বিবেক অত্যন্ত কম, নেই বললেই চলে। সভ্যতা নেই, আপন পর জ্ঞান নেই, মা-বোন বোধ নেই। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়েছে শুধু বিবেকের আক্কল-পছন্দে। যে মানুষের মধ্যে ভাবনা চিন্তা নেই, তার সঙ্গে তার বাড়ীর পোষা জানোয়ারটির কোন তফাৎ নেই। খাওয়া দাওয়ায়, যৌন ক্রিয়ায় এবং জীবন যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে অনেক প্রাণীই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পিপিলিকা ও মাছির ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে বেশী। রুচিতে কুকুর ও বিড়াল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়শক্তিতে চড়ুঁই পাখি মানুষের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী। দেহাবয়বে হাতী মানুষের চেয়ে অনেক বড়। বানর মানুষের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষিপ্র এবং চলশক্তিতে দ্রুততর। তবে মানুষ শ্রেষ্ঠ হল কিসে? একমাত্র তার জ্ঞান গরিমায়, বিবেক-বিবেচনায়। হাতীর মগজ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর মগজ দেখতে খুব একটা কম দেখা যায় না। **তা-বলে একটা হাতী এত বড় বিরাট দেহ নিয়ে আইনষ্টাইন হতে পারেনি।** এই যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমন সব আজব লীলা দেহের ভিতর ঘটছে যা সূক্ষ্মতম চিন্তা করে দেখলে একটা বিবেকবান মানুষকে না ভাবিয়ে তুলতে পারে না। নারী-পুরুষের মিলনের পরে উভয়ের ২৩টি করে ৪৬টি ক্রোমোজম মিলে প্রথমে একটা কোষের সৃষ্টি হয়। আশ্চর্যজনক ভাবে এতে জীবনের স্পন্দন শুরু হয়ে যায়। কেমন করে

জীবন শুরু হয় বিজ্ঞানীরা এটার কারণ আজও জানেন না।

প্রথম কোষটি নারী গর্ভের কোন এক জায়গায় আটকে থাকে। কোন হুক নেই, বন্ধনী নেই, কেন আটকে থাকে? বিজ্ঞানীরা এটার কারণ এখনও জানেন না। প্রথম কোষ বিভক্ত হয়ে ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে এবং মাত্র ৫০ বার বিভক্ত হলে ত্রিশ কোটি কোটি জীবকোষ সৃষ্টি হয়। তারা বলেন, এটার কারণও আমরা জানিনে। এই কোষে ক্রমে ক্যালসিয়াম সৃষ্টি হয়ে হাড় তৈরী হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হতে হতে হৃৎপিন্ডের সৃষ্টি হয়। হৃৎপিন্ড কেন স্পন্দন করে এবং দেহে রক্ত সঞ্চালিত করে বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করে বলেছেন, হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের কারণ আমাদের জানা নেই। কে এটা প্রথমে একটা ধাক্কা দিয়ে বা ঝাকুনি দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল, আমরা বলতে পারিনে এবং কে এখনও এতে সদা গতি সৃষ্টি করেই চলেছেন বলতে পারিনে।

বিরাট চাঞ্চল্য

ইদানিং আরো একটি আশ্চর্য খবর প্রকাশিত হয়েছে। সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করে জনৈক তুর্কী বিজ্ঞানী স্পষ্টভাবে হৃৎপিন্ডের ভিতরের একটা নক্সা পেয়েছেন, তার আকার হচ্ছে আরবীতে হুবহু আল্লাহ্ লেখার মত। বলা বাহুল্য এই জিনিসটিই হচ্ছে আল্লাহ্ নামের নক্সা– যিনি দেহের সমস্ত কিছু সৃষ্টির মালিক এবং যিনি দাবী করেন সব খবর আমিই জ ানি। তিনি বলেন, নারী পুরুষের একটা নাপাক পদার্থ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি। তাই তার ভাষায়, "মিন আমশাজ"। তিনি কুর'আন শরীফের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে মানব দেহ সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ধারাবাহিক ভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমে মানুষ ছিল নারী পুরুষের মিলিত পদার্থ অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজম সমন্বিত একটি কোষ যাকে 'আমশাজ আলাক' বলা হয়েছে। তারপর এ কোষগুলো বিভক্ত হতে হতে গোস্তের খন্ডে পরিণত "মাজগা" তে পরিণত করা হয়েছে।

পরবর্তী পর্যায়ে তাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে আকৃতি দিয়ে মানবাকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীম" (আল-কুর'আন)– অর্থাৎ মানুষকে নিশ্চয়ই সবার ওপরে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি।

বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারীরা কি বলেন?

সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হৃৎপিন্ডের একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার যিনি করেছেন, তার নাম ডঃ নূর-তুর্কী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে হৃৎপিন্ডের এই মহারহস্য আবিষ্কার জ্ঞানীগুণী লোককে স্তম্ভিত করে দিয়েছে এবং নাস্তিক জগতকে করেছে দিশেহারা হতবাক। এই মহাবিজ্ঞানীর পুরো নাম ডঃ খুলুক নূর তুর্কী। তিনি তার গবেষণাগারে অতি সূক্ষ্ম গবেষণা করে হৃদপিন্ডের যে মহারহস্য স্বচক্ষে দেখে আবিষ্কার করেছেন, সৌদির রাজধানী রিয়াদের 'আদ্দাওয়াহ্' পত্রিকায় তা বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়েছে। সোনার বাংলা পত্রিকায় এ খবরটি আমাদের দেশেও প্রকাশ করেছিল। ১৯৮৪ সনের ১৭ই জুন, বাংলা ২রা আষাঢ় রবিবার, ১৩৯০ সন এবং ১৬ই রমজান হিজরী ১৪০৪ তারিখে। আদ্দাওয়াহ্ পত্রিকায় ডঃ খুলুক নূর তুর্কীর আবিষ্কার সম্বন্ধে যে চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়েছিল, পাঠকবর্গের সুবিধার্থে তা তুলে দিচ্ছি (ছবি সংযুক্ত) । দীর্ঘ দিন ঘরে থাকার কারণে কাগজটির লেখা অস্পষ্ট হওয়াতে কিছু বিচ্যুতি থাকতে পারে তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। বামদিকে হৃৎপিন্ডের নক্শাা এবং তার মধ্যে আল্লাহ্র নামের নক্সা, ডানদিকে ডঃ খুলুক নূর তুর্কীর ছবি ছিল।

মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতে একমাত্র মানুষই হল সেরা জীব। জ্ঞান ও বিবেকের দ্বারা তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব উপহার দিয়েছেন। তিনি চান জ্ঞান ও বিবেককে মানুষ সুপথে পরিচালনা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব চিরন্তন করে রাখুক, অক্ষুণ্ন করে রাখুক। কিন্তু কর্মময় পৃথিবীতে যারা অনেক সময় ভুলে যায় তার স্রষ্টার কথা, ভুলে যায় এ জগতের অনেক রহস্যের কথা। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ চান না যে, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন এবং ভুলে যাবেন। রহস্যাবৃত মানব জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যায়, যা থেকে এ কথার প্রতিধ্বনি ভেসে আসে যে, এ বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুই যেন অদৃশ্য এক মহাশক্তির হাতছানিতে পরিচালিত হচ্ছে। এমনিভাবে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও যেন সে মহাশক্তির অদৃশ্য ইঙ্গিতে চলে। মানব হৃৎপিন্ডে আল্লাহ্র নামের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বিংশ শতাব্দীর ঐ তুর্কী হৃৎপিন্ড বিশেষজ্ঞ। তিনি আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, একদিন আমি খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম কিন্তু আমি আনন্দের আতিশয্যে তখনই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। যখন হৃদপিন্ডের ছবিতে আল্লাহ্র নাম প্রতীয়মান হচ্ছিল। আমি অবলোকন করেছি এবং গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। হৃদপিন্ডে যে আল্লাহ্র নাম অঙ্কিত

হয়েছে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ডঃ খুলুক নূর তুর্কী বলেন, মনে হয় কোন শরীরী জীব তার অঙ্গুঁলি দ্বারা হৃদপিন্ডের (ক্বলবের) উপর আল্লাহ্‌র নাম এঁকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, মানব দেহের যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অংকিত রয়েছে সেটাই হৃৎপিন্ড (ক্বলব), মানব জীবনের একমাত্র অবলম্বন (Source of human life)। সৌদির রাজধানী রিয়াদের "আদ্দাওয়াহ্" পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংখ্যায় এ তথ্য প্রকাশিত হয়। এই অভূতপূর্ব আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর মানবকুলকে কি উপহার দিয়েছে, তা একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। এ আবিষ্কার মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে বিশেষ করে (Medical Science) কে নাস্তিকতাবাদী দর্শন থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের আরও কিছু চাঞ্চল্যকর প্রমাণ

ইসলাম আবির্ভাবের পর থেকে আজ অবধি ইসলাম বিরোধীরা দুনিয়ার শক্তি নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে তৎপর রয়েছে। আর সেই সময় ইহুদি নাছারাদের দেশেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ দিবালোকের মত সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনে রীতিমত অকল্পনীয় হলেও এটা সত্য। জার্মানীর রাজ ধানী "বনের" এক উদ্যানে (আল্লাহ্ প্রদত্ত) শুধু গাছের ডালগুলো ও কান্ডের সমন্বয়ে পবিত্র কলেমা তৈয়্যবা– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্" (সাঃ)-এই বাক্যগুলো লেখা হয়েছে।

বহুল প্রচারিত "ওকাজ ডেইলি" পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিটি এখানে সংযোজিত করা হল।

প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্বের চাঞ্চল্যকর প্রমাণ



ছবিটি জার্মানীর রাজধানী বন-এর একটি উদ্যান থেকে তোলা। প্রকৃতির শোভা অপরূপ নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার মধ্যেও আরেক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে এই ছবির মাধ্যমে। এই ছবির মাধ্যমে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"। এই লেখাটি কারো হাতে লেখা নয়। গাছের ডালের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবেই আরবী হরফে এটি সম্পাদিত। "ওকাজ ডেইলী" পত্রিকার সাংবাদিকরা এ খবর পেয়ে ছুটে যান সেখানে এবং প্রকৃতির কাছে অভিভূত হয়ে পড়েন তারা। - সাউদী গেজেট



অস্ট্রেলিয়ার প্রাণকেন্দ্র সিডনী শহরের নিকটে একটি বনে এই গাছটি রয়েছে। এটি এমনভাবে রয়েছে যেন একটি মানুষ জুব্বা (সুন্নতী পোশাক) পরে নামাজে রুকুরত অবস্থায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আজ ীম" তাছবি পাঠ করছে। আরও আশ্চার্য্য সংবাদ এই যে, গাছটি সিডনী থেকে কেব্‌লার দিক মক্কা শরীফের দিকে মুখ করা অবস্থায় রয়েছে।


اكتشاف عجز عنه العلم حتى الساعة

اسم "الله" فوق جزء من قلب الانسان

vesikalar konuşuyor

SCIENCE DIGEST

Réalités

শরিয়তে ছবি ছাপা নিষিদ্ধ বিধায়- বৈজ্ঞানিকের ছবি প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

লেখক

বাম দিকে হৃপিন্ডের নক্‌শা এবং তার মধ্যে আরবীতে আল্লাহ্‌র নামের নক্‌শা



পাকিস্তানের রাওয়াল পিন্ডির একটি গ্রামের কবরে আজ দাহা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হল

কবরে আজদাহা

সৌদী আরব ও পাকিস্তানে সংঘটিত একই ধরণের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঘটনাগুলো ঘটেছে কবরে লাশ দাফন করার সময়।

সম্প্রতি জর্ডানের জুরকা শহরে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এক যুবকের লাশ দাফনের জন্যে নিয়ে গেলে, কবরের ভেতর থেকে ভয়ংকর আকৃতির এক আজদাহা বেরিয়ে আসে। ঘটনার আকস্মিকতায় ভয় পেয়ে উপস্থিত অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। স্থানীয় এক আলেমের পরামর্শে ৪০০ হাত দূরে আরেকটি কবর খোঁড়া হয়। লাশ কবরে রাখার পূর্ব মুহূর্তে বিরাটকায় আজদাহাটি দ্বিতীয় কবরেও চলে আসে। পূর্বোক্ত আলেমের পরামর্শ মতো লোকজন আবার প্রথম কবরে ফিরে আসে এবং কাঠ ও লোহা দিয়ে বেড়া বানিয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এতেও রেহাই পাওয়া যায়নি। লাশটিকে কবরে রেখে মাটি চাপা দেয়ার পূর্বক্ষণে সাপটি বিকটগর্জন করতে-করতে ছুটে এসে কবরের শক্ত প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে ফেলে, সাপটির মাথা ভয়ংকর রূপ নিয়ে মৃত ব্যক্তির মাথার কাছে পৌঁছে যায়। ভীতসন্ত্রস্ত উপস্থিত সকলে হতভাগ্য ব্যক্তির মরদেহের হাড় ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাপটির জিহ্বা ছিল জ্বলন্ত লৌহখন্ডের মতো, গর্জন ছিল ভয়ংকর।

অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির নিকটবর্তী একটি গ্রামে। একটি মরদেহ কবরস্থ করতে গেলে কবরের মুখ এমন ভাবে বন্ধ হয়ে যায় যেন ওখানে কোনো কবরই খোঁড়া হয়নি। স্থানীয় এক আলেমের পরামর্শে দ্বিতীয় কবর খোঁড়া হলে আগেরটির মতো সেটির মুখও বন্ধ হয়ে গেল। উপস্থিত লোকজন আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি শুরু করে। তৃতীয়বার কবর খোঁড়া হলে কবরের মুখ আর বন্ধ হলো না কিন্তু লাশটিকে কবরে রাখামাত্র বিষাক্ত সাপ আর বিচ্ছুতে কবরটি ভর্তি হয়ে গেল। তারপর বিশাল দু'টি সাপ তার মাথা ও পায়ের দিক থেকে বুকের ওপর এসে থেমে যায় এবং করাত দিয়ে কাটার মতো মরদেহটি টুকরো টুকরো করে ফেলে।

প্রথমোক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে সৌদী আরবের দৈনিক 'ওকাজ' পত্রিকায়, দ্বিতীয়টি পাকিস্তানের দৈনিক 'জং'-এ।

কে শেখাল এ অবোধকে?

মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্য হজম হবার ফলে বিভিন্ন রকমের হজমি রস বা এনজাইম বের হয়। যদি তা না হত তবে মানুষ পেট ফেঁপে ফুলে মরে যেত। যেসব গ্রন্থি বা তারের মত জিনিস থেকে হজমি রস (যার মধ্যে পেপসিন ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড প্রধান) বের হয়, সেই গ্রন্থিগুলোর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। এত তার কেন এবং কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে বহু-ভাবনা করেছেন। পাকস্থলীর এক কোণে পাইলোরাসকে কে শেখাল সময়মত খাদ্য খালাস করে দিতে এবং কে আবার তাকে দরজা বন্ধ করতে শেখাল– বিজ্ঞান এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। পাকস্থলীর ৩ কোটি ৫০ লক্ষ তার এত সঠিক হিসাব করে ঠিকমত সাজানো, **অতি অন্ধকারে পাকস্থলীর ফ্যাক্টরীতে কোন পরিপক্ক প্রকৌশলীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং চেষ্টা ছাড়া কি একা একাই হওয়া সম্ভব? বিবেক কি বলে?** পাইলোরাস একটা অবোধ যন্ত্র, সে কি কারুর নির্দেশ ছাড়া নিজে জ্ঞান খাটিয়ে খাদ্য খালাসের ঠিক সময়টা নির্ধারণ করে তা খালাস করতে পারে? অবিশ্বাস মানুষকে একেবারেই শ্বাসরোধ করে রাখে।

খাদ্যটা প্রায় তরল পিন্ডের মত হয়ে পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে ক্ষুদ্র অন্ত্রে যখন ঢোকে, লক্ষ লক্ষ শুয়া বা ভিলি ঐ খাদ্যের ভিতর থেকে নানা পদের খাদ্যসার কেমন করে ছেঁকে নেয় এবং কেনই তারা ডানে বামে ওপরে নীচে নৃত্য করে, বিজ্ঞানীরা তার কারণ জানেনা। কে তাদেরকে এমন অদ্ভূত নৃত্য করায়?

খাবারের সারগুলো রক্তবাহী নালী দিয়ে যাতায়াত করে দেহকে চালিয়ে নিয়ে যায়, যে সব নালী দিয়ে রক্ত চলাচল করে। তাদের কোন কোনটা এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে দেখা যায় না। এক ইঞ্চির তিন হাজার ভাগের এক ভাগের সমান একটা রক্ত কণা। কত কত রক্তবাহী নালী এত ক্ষুদ্র যে, এই রক্তকণা তার ভিতর দিয়ে যাবার কালে যেখানে নালীটা বেঁকে গেছে, সেখানে দু'ভাঁজ হয়ে অতিক্রম করতে হয় এই অত্যন্ত সূক্ষ্ম চিকন তারগুলো যে সৃষ্টি করেছে, তার নজরটা এবং প্ল্যানটা কতই না সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ। রক্তবাহী নালীগুলো যদি একত্র জোড়া দিয়ে লম্বা করা যেত, তাহলে তার দৈর্ঘ্য হত ১২ হাজার মাইলেরও বেশী। সাড়ে তিন হাত একটা দেহে ১২ হাজার মাইল বিস্তৃত এত বড় একটা বিশাল লম্বা তার কেমন করে আঁটিয়ে রাখা হয়েছে, তারা বিজ্ঞানীরা ভেবে মাথা নত করেছেন।

মানুষের শ্বাসনালীর ভেতরে রয়েছে প্রায় দু'শো কোটি বায়ুপথ এবং প্রতিটি পথের শেষে একটি করে বায়ুথলে রয়েছে এরা দিয়ে ছাঁকনির মত নিঃশ্বাসকে ছেঁকে রক্তে মিশিয়ে মানুষের জীবন প্রতি মুহূর্তে জিইয়ে রাখে। অন্ধকার গর্ভ-কবরে এত ছাঁকনি কেমন করে সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানীরা এর জবাব দিতে পারেননি। প্রতিটি কিডনিতে রয়েছে প্রায় দশ লক্ষ তারের মত মুত্র গ্রন্থি। কিড্‌নি বা বৃক্কের মোট জালকের সংখ্যা রয়েছে প্রায় বিশ লক্ষ। দেহের সম্পূর্ণ রক্তই কিছুক্ষণ পরপর বৃক্ক দিয়ে যায় এবং তাকে কে শেখাল দেহের সম্পূর্ণ রক্তের রাসায়নিক ভারসাম্য এত সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে! বৃক্ক না থাকলে দেহে হয়ত রক্তের পানীয় ভাগ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে মানুষটা ফুলে ঢোল হয়ে মরে যেত। এ বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য কিডনিকে এ বুদ্ধি কে দিল? কে দিল এই মাথাহীন, জ্ঞানহীন, অবোধ যন্ত্রটিকে এত যাচাই-বাছাই করে দেহের তরল পদার্থের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা? তাই কিড্‌নীর স্রষ্টা বলেন, "আফালা তা'কেলুন" অর্থাৎ তোমার মাথায় কি শুধু যুক্তিই ধরে, আর কোন জ্ঞানই কি ধরে না?

মানুষের মগজ যে কিভাবে কাজ করে কোন বিজ্ঞানী আজও তা সঠিক করে বলতে পারেননি। মগজের ভিতর এক্সচেঞ্জ সেন্টারটা এত বড় যে, একশত এক তলা বাড়ীর ছ'টি বাড়ীর সমান এবং যন্ত্রপাতির ওজন কয়েক শত টন। এত বড় একটা বিপুলায়তন অফিস মাথার মগজের এককোণে, ধরুণ এক ইঞ্চি জায়গায় আটকে আছে। এটা কেমন করে সম্ভব, কল্পনা করতেও অবাক লাগে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মগজ যে কিভাবে কাজ করে কেউ কোনদিন বলতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও হয়ত পারবে না।

আর এক অদ্ভুত যন্ত্র-নাসিকা

নাসিকা আর এক অদ্ভুত যন্ত্র। নাসারন্ধ্রের ভিতরে কোথায় একটুখানি গোস্তের ছোপ লুকিয়ে আছে, এত হাজার রকমের সুগন্ধ, দুর্গন্ধকে চট্ করে ধরে ফেলে। চোখে যা ধরা পড়ে না, নাক সে অলক্ষ্য জিনিষের খবর দিতে পারে। একদিন কাঠালী চাঁপা গাছের নীচে বসে সুগন্ধ পেলাম। চারিদিকে কতই তাকাতাকি করলাম, কোন ফুল দেখতে পেলাম না কিন্তু নাকে ঘ্রাণ আসতেই থাকল। এতে নিশ্চিতভাবে বুঝলাম, একটা ফুল ফুটে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

লোকে বলে দাঁত থাকতে দাঁতের মূল্য বোঝা যায় না। ঠিক তেমনি নাক থাকতে নাকের মর্ম বোঝা যায় না, যদি নাকে সর্দি না ধরে। সর্দি হলে বা সর্দিতে নাক ভর্তি হলে খেতে বসে মাছের মাথা চিবানোর সময় মনে হয় একখন্ড লাকড়ি চিবোচ্ছি, না ঘাস খাচ্ছি। তখন নাক কি ছিল তা বুঝা যায়। এমনিভাবে হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, কিড্‌নি, মগজ ইত্যাদি যে কোন অঙ্গ বিকৃত হলেই না তাদের মূল্য ঠিক বোঝা যেত! এই মুহূর্তে আপনার বেঁচে থাকতে এবং এই বইখানা পড়তে আপনার দেহের ভিতরে যে কর্মকান্ড হচ্ছে তা ভাবতেও চিন্তায় মাথা বিভোর হয়ে ওঠে।

সবার ওপরে একটি ভাববার কথা হচ্ছে, মানুষ নিশ্বাসের ওপরেই বেঁচে থাকে। নিশ্বাস দিয়ে অক্সিজেন ঢোকে এবং সেটা ফুসফুস ছেকে রক্তে মিশিয়ে দেয়। এ কারণে রক্ত জমাট বাধে না, রক্ত কনিকাগুলো চলমান থাকে এবং দেহের রন্ধ্রের রন্ধ্রের প্রবেশ করে। চোখ, মুখ, নাক, কান, প্লীহা, মাথা, হৃৎপিন্ড, প্রেম-ভালবাসা, বড় সাহেব, ছোট সাহেব, বিবি সাহেবা ইত্যাদি সবাইকে কর্মক্ষম রাখে এবং এভাবে অফিস আদালত, গৃহস্থালী, ঘর-সংসার তাজা থাকে। নিশ্বাসই মানুষের জীবন ধারণের প্রধান উপকরণ, একে প্রধান খাদ্যও বলা চলে। আপনার বাড়ীতে নতুন আত্মীয় এসেছেন, ভাল খাবার দাবার খাইয়ে দু'মিনিট ঠাট্টা করে তার নাকটা এঁটে ধরে রাখুন। দেখবেন, পোলাও কোর্মা যা খাইয়েছিলেন, কোথায় যায়।

এখন ভাববার কথা হচ্ছে, এ নিশ্বাসের বাড়ী কোথায়, কোথা থেকে এর বুনিয়াদ সৃষ্টি হয়। রক্তপায়ী বাদুড়ের নিস্তব্ধ হামাগুড়ির মত নিশ্বাস ভিতরে আসে, আবার প্রশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যায়। এমনি যাওয়া আসার ভিতর দিয়েই একদিন মানব জীবনে বিদায়ের কালসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে।

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।

শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও

শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও এটা অত্যন্ত নগ্ন সত্য কথা যে, আমরা কোন সময়েই আমাদের কাছে থাকিনে, কবি বলেছেন–

মানুষেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।

নিঃশ্বাসের বাড়ী কোথায় বলতে গেলে জ্যোতিষশাস্ত্রের এক ফোটা আলোচনা করতে হয়। দুনিয়ার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় হচ্ছে সূর্য। প্রায় ন'কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সূর্যটা মাটির পৃথিবীতে আলোর রেখাপাত করে। বারশো থেকে পনের শত সেলসিয়াস তাপে লোহা গলে। ষোল শত থেকে আঠার শত সেলসিয়াস তাপ সৃষ্টি হলে পাকা লোহা গলিয়ে পানি করে দেয়া যায়। সূর্যের শরীরে তাপমাত্রা রয়েছে চার কোটি সেলসিয়াস। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, দু'কোটি সেলসিয়াস। এই প্রচন্ড তাপে সূর্যের হাইড্রোজেন পদার্থগুলো পুড়ে সূর্য ঠিক অনবরত প্রজ্জল্যমান রয়েছে। প্রতি সেকেন্ডে সূর্যের আগুন জ্বেলে ঠিক রাখতে ৪০ লক্ষ টন পদার্থপুঞ্জ জ্বলে শেষ হয়ে যায়। সূর্যের গায়ে প্রতি বর্গইঞ্চিতে চাপ রয়েছে আট কোটি মণ। প্রতি বর্গইঞ্চিতে এই অসহ্য তাপ আর ভীষণ চাপের চোটে সূর্যের ভিতরে পরমাণূ (Atom) গুলো ফেটে পড়ছে এবং এক হাজার গ্রাম হাইড্রোজেন পুড়ে ৯৯২ গ্রাম হিলিয়াম সৃষ্টি হয়। বাকী আট গ্রাম খুরে যাওয়া হাইড্রোজেন কিউশন প্রক্রিয়ায় প্রচন্ড তাপ ও আলোর বিচ্ছুরণ সূর্য থেকে ঠিকরে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং মাটির পৃথিবীতে অতি সামান্য আলো আর তাপ

এসে পড়ছে। শুনলে অবাক হতে হয়, সূর্যের সম্পূর্ণ আলো আর তাপকে যদি আঠার কোটি টাকা পরিমাণ মনে করা হয়, তবে মাটির দুনিয়ায় মাত্র ন'টাকা পরিমাণ আলো আর তাপ এসে পড়ে। আর বাদ বাকী সব অন্য দিকে ছড়িয়ে যায়।

সূর্যের ভিতরে অনবরত মহা প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটছে এবং তার কারণে সৌরবিশ্বে জ ীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদি বেঁচে আছে। সূর্যের আলো মাটির পৃথিবীতে যখন পড়ে, তখন গাছপালার শাখায়-শাখায় পাতায়-পাতায় নতুন জীবনের সঞ্চারণ শুরু হয়। পাতা সূর্যালোক থেকে খাদ্য সংগ্র করে একটা শ্বাস ছাড়ে, এই শ্বাসের নামই হচ্ছে অক্সিজেন। ওদিকে গাছকে জীবন্ত রাখতে তার গোড়ায় পানি সঞ্চার করতে হয়। তা সম্ভব হয় নীরবে নীরবে। সূর্যের কিরণ সাগরের পানির ওপরে পড়ে, ওকে উত্তপ্ত করে বাষ্প করে দেয়। আবার সূর্যের তাপে বাতাস উলট-পালট হয় এবং এই হাল্কা বাষ্পগুলোকে বাতাস শুষে আকাশে উঠিয়ে নেয়। সেখানে শৈত্যের (Humidity) স্তরে বাষ্পগুলো জমে মেঘের আকার ধারণ করে এবং পৃথিবীর আকাশে বর্ষণ মুখর হয়ে ওঠে। বৃষ্টি হয় এবং গাছপালা প্রাণ পায়। এই জীবন্ত গাছপালা নিশ্বাস ছাড়ে, যেটা অক্সিজেন হয়ে আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে জীব জন্তুর এবং মানুষের নাসিকা রন্ধ্রের নিশ্বাসের সাথে ফুসফুসের বায়ুথলে গিয়ে ছেঁকে রক্তে মিশে রক্তকে তরল থাকায় সাহায্য করে, অন্যান্য রাসায়নিক ক্রিয়া করে এবং রক্ত তরল থাকার কারণে হৃৎপিন্ডের চারটি কোঠায় ভাল্‌বের মাধ্যমে অনায়াসে যাতায়াত করে, হৃৎপিন্ডকে ঠিক রাখে। হৃৎপিন্ড ঠিক থাকার মানে সংক্ষেপে জীবন বেঁচে থাকা। যদি অক্সিজেন দেহে না ঢুকতো, তবে রক্ত জমাট বেঁধে যেত, হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যেত। শূন্য লাগত এ ধরণী তল, প্রিয়জনের চোখের অশ্রুতে ভেসে দূর ধামে ঠাঁই নিতে হত।

এইজন্য বলেছিলাম আমরা কোন সময়ই আমাদের কাছে থাকিনে, প্রতিটি মানুষ ন'কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল ওপরে সূর্যের গায়ে ঝুলে আছে। আপনার কথা, ভালে-াবাসা, দৃষ্টি, দস্তখত, পদচারণা, নড়াচড়া-এক কথায় সম্পূর্ণ জীবনটাই ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল শূন্য থেকে নেমে আসছে। তাই মহান আল্লাহ্ বলেন, "সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছি। তবু কি তোমরা আমাকে দোষারোপ করবে? আমাকে অবিশ্বাস করবে?"

অনেকেই এ মারাত্মক ভুলে ভোগে

অনেকেরই ধারণা-স্রষ্টা অসীম আর মানুষ সসীম। অসীমের সঙ্গে সসীমের তথা মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র কি যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব? মানুষ কি আল্লাহ্‌কে ধরতে পারে? আল্লাহ্ হচ্ছেন অদৃশ্য (Invisible), মানুষ দৃশ্যমান (Visible)। যাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না,তাকে কেমন করে ধরা যায়? সহজ কথায় গায়েব বা অদৃশ্য কিছুকেই ধরা সম্ভব নয়। কথাটা শুনতে সহজ শোনায় এবং যুক্তিতেও খাটে। কিন্তু একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, এই ধারণা আসলে সত্য নয়, অলীক। মানবদেহ এবং তার অংগ-প্রত্যংগের গঠনাবলী এমন বিচিত্র এবং আশ্চর্য যে, মানুষ দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন হয়, যদি সে চেষ্টা করার মত চেষ্টা করে।

আমরা যা দেখিনে, তাইতো আমরা ধরতে পারিনে। এই ধারণাটি ঠিক নয়। এমন অনেক জিনিস আছে, যা আমরা দেখিনে অথচ আলবত ধরতে পারি। কেননা আমাদের ধরার মত সেই যন্ত্র আছে। যেমন– ফুলের ঘ্রাণ বায়ুতে দুর্গন্ধ-সুগন্ধ কেউই আমরা দেখিনে। যে কোন গন্ধই গায়েব (Invisible), দেখা যায় না। কিন্তু নাসিকার ভেতরে এমন একটা যন্ত্র আছে, যা দিয়ে আমরা এ গায়েব ধরে ফেলতে পারি। আগেই বলেছি কাঠালী চাঁপা দেখলাম না কিন্তু নাক তাকে ধরে দিল। অনুরূপভাবে শব্দ একটা অদেখা জিনিস, কান তাকে ধরতে পারে। শৈত্য বা ঠান্ডা অদৃশ্য বা গায়েব, দেহের ত্বক তাকে নিখুঁতভাবে ধরে, শব্দ যা গায়েব তা ধরে কানে। কিন্তু গায়েবের মধ্যে গায়েব হচ্ছে কোন শব্দ বা কথায় যদি কোন গালি বা উত্তেজনাময় কোন কিছু থাকে। শব্দের মধ্যে গালি হচ্ছে আরও গায়েব যা ধরবার আর একটি যন্ত্র রয়েছে মগজ। ভয় একটা গায়েব, এই গায়েব ধরার একটা যন্ত্র মনের কোথায় লুকিয়ে আছে। এমনিভাবে এতগুলো গায়েব ধরার যন্ত্র যিনি এ দেহে সৃষ্টি করেছেন তিনি একেবারে মানুষের নাগালের ভিতরে এসে ঘোষণা করেছেন, "ওয়া ফি আন ফুসিকুম আফালা তুবছিরুন"- (আল-কুর'আন) আমি তোমার মধ্যে আছি তবু তুমি আমাকে দেখবে না? তিনি আরও বলেন, "ওয়া নাহ্নু আকরাবু ইলাইহি মিন হাব্‌লিল ওয়ারিদ"– (আল-কুর'আন) অর্থাৎ আমি তোমার মেরুরজ্জুর, জীবনশিরার চেয়েও নিকটে আছি, তবু তুমি আমাকে অবলোকন করলে না? **যিনি মানব দেহে এতগুলো গায়েব ধরার যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাকে ধরার কোনই যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারেননি?**

তিনি গায়েব সত্য কিন্তু তাকে ধরার একটি অদ্ভুত যন্ত্র তিনি মানুষের মধ্যে দিয়েছেন।

আগেই দেখানো হয়েছে যে, দেহের বহু যন্ত্রের রহস্য বিজ্ঞানীরা আজও আবিষ্কার করতে পারেননি। ঠিক এমনি **একটি রহস্যপূর্ণ দুর্বোধ্য যন্ত্র রয়েছে দেহে, তার নাম 'ক্বল্‌ব'। নাক দিয়ে যেমন সুগন্ধ ধরা যায়, কান দিয়ে শব্দ ধরা যায়, দেহ নিয়ে শীতলতা, উষ্ণতা অনুভব করা যায়, ক্বল্‌ব দিয়ে তেমন আল্লাহ্‌কেও ধরা যায়। নাকে যেমন সর্দি আটকালে ফুলের ঘ্রাণে দুর্গন্ধ আসে, কান বধির থাকলে যেমন সে কোন শব্দ শুনতে পায় না, তা বলে নাকে ঘ্রাণ ধরতে পারে এ কথা যে অস্বীকার করে সে একটা বেকুব ছাড়া কিছুই নয়। ঔষধ খেয়ে নাক সাফ হলে নাক নাকের কাজ করেই, মানে গায়েবের গন্ধ ধরেই। এমনই ক্বল্‌ব যাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, ক্বল্‌বে ময়লা আট্‌কে মরিচা ধরছে, তারা অন্ধ যুক্তি করেই যায় এবং আল্লাহ্‌র সাথে যোগসূত্র হওয়াটাকে অস্বীকার করে। আসল কথা হ'ল সব জিনিস সবাই বোঝে না, মানে না, এ শুধু জ্ঞানের খর্বতার জন্যই হয়।**

কেউ বলতে পারে, ক্বল্‌ব যে আল্লাহ্‌র মত একটা গায়েব ধরতে পারে, তার প্রমাণ কি? কোন কোন জিনিস আছে যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যেমন– পুরুষের মধ্যে শুক্রকোষ বা কীট থাকে যা থেকে সন্তান উৎপাদন হয়। শিশু অবস্থায় এ শক্তিটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। খাদ্য খেয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে ফেলতে, প্রকৃতি আলো হাওয়ায় বছরের পর বছর ধরে সময়ের ব্যবধানে এই পুরুষত্ব শক্তি ক্রমে ক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জাগ্রত হয় তার সুপ্ত শক্তি ক্ষমতা, প্রেম-প্রীতি এবং মিলনের সমন্বয়ে উন্মোচিত হয় সুপ্ত শক্তির অবগুণ্ঠন, সে সন্তানের পিতা হয়। নারী শিশু একদিন সন্তানের মা হয়ে ওঠে। একটা নারী শিশু চার লক্ষ ডিম্বকোষ মানে সন্তান ধারণের মত উপযুক্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ঐ নারী শিশু কি সদ্যজাতা অবস্থায় গর্ভ থেকে পড়েই কোন সন্তান ধারণ করতে পারে? যদি কেউ বলে, এই সদ্যজাতা মেয়েটি যে সন্তান ধারণ করতে পারে, একথা এখন প্রমাণ করে দেখাও। এ ধরণের কথা যে বলে, সেকি বিবেক বিবেচনা করে কথাটা বলল? সব ক্ষেত্রে এক্ষুণি দেখাও। একটা প্রথম শ্রেণী ছাত্রকে এম, এ, পাশ করিয়ে দেখাও। কারণ স্কুলে ভর্তি হলেই তো সে ক্রমে বি, এ; এম, এ, পাশ করে। এ রকম সর্বক্ষেত্রে যারা ভাবনা-চিন্তা না করে কথা বলে, তাদের অবস্থাটা কেদারীর মত।

কেদারী নামে একজন খুব সরল এবং বুদ্ধু কিসিমের লোক ছিল। তার বিয়ের তারিখ ঘনিয়ে এলে সে জুতো কিনতে গেল। কিন্তু দশ নম্বরের জুতো বহু খোঁজা-খুঁজির পর এক জোড়া পাওয়া গেল। তাই প'রে মুরাসা মাথায় দিয়ে সে বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে বিয়ে করল। পরদিন বিদায়ের পালা। পাত্রীকে তার সঙ্গে যখন উঠিয়ে দেয়া হল, সে এদিক সেদিক তাকায়। বিবির সামনে পেছনে তাকায়। লোকে তাকে জিজ্ঞেস করে, এদিক ওদিক তাকাও, হাট, আবার দাঁড়িয়ে ভাব কি? কেদারী গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, তোমরা

কি বুঝ? ছেলে কই? সবাই জিজ্ঞেস করল কার ছেলে? কেদারী উত্তর দিল, কেন, আমার ছেলে, এই যে কাল রাতে বিয়ে করলাম! সবাই বললো এ কি সম্ভব? কেদারী দুঃখিত হয়ে উত্তর দিল, হায় কপাল, আমার ভাগ্যেই আসলে ছেলে নেই। নইলে কথাটা কি মানুষের মিথ্যে বলে, বিয়ে করলে ছেলেপেলে হয়। কিন্তু আমি কত আশায় বিয়ে করলাম, আমার তো ছেলে হল না।

সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের অবস্থা কেদারীর মত। তাৎক্ষণিকভাবে সব জিনিস বুঝতে চায় এবং সর্বক্ষেত্রে নিজের মনের চিন্তা এবং বুঝকেই সার মনে করে এবং নিজের সীমিত জ্ঞানের ওপরে বিশ্বাস করে এমন গোঁ ধরে থাকে যে, শত যুক্তি দিয়েও তার অন্ধ বিশ্বাসকে উল্টানো যায় না। সে শুধু তার জ্ঞানকে এবং যুক্তিকেই তার প্রভু বানিয়ে দিয়েছে। তার নফ্স বা মন তাকে যা বলে সে তাই করে। যা হতে পারতো, তা কোন দিনই তার কপালে হয় না। সে চন্দ্রে শুধু কলংক দেখে, আলো দেখে না, সে জড়বাদী, তার চিন্তারই জড় বা শিকড় নেই। বিশ্বাসী মন নিম্নগামী, নীচু। নীচু জায়গায়ই পানি জমে। টেংগরের টিলায় পানি জ'মে উর্বর হয় না, বৃষ্টিতে সে টিলা দিনে দিনে ক্ষয়ে উচাটন হয়। চিরকাল শুষ্ক ও খাড়া থাকে, ফলে-ফুলে কোন দিন শোভিত হয় না।

মানুষের ভিতরে গায়েবের জিনিস ধরার অনেক যন্ত্র আছে। যেমন– নাক, কান, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি। ঠিক এমনি অংগও রয়েছে ভিতরে যা দিয়ে আল্লাহ্র মত গায়েব একটা মহাশক্তিকে ধরে ফেলতে পারে। শিশুর মধ্যে যেমন শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে, বয়স কালে এবং অনুরূপ পরিবেশে তা প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি মানুষের ভিতরে ক্বল্‌ব নামে গায়েব ধরার একটি অত্যাশ্চর্য যন্ত্র রয়েছে। এটা সুপ্ত থাকে, বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা জাগ্রত হয় এবং যখন উপযুক্ত হয় তখন এতে আল্লাহর নক্সা ফোটে। এক খণ্ড লোহা যেমন নীরব হয়ে পড়ে থাকে, এতে ধারাল অস্ত্র হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা ধারাল অস্ত্র হতে আগুনে পুরতে হবে, হাতুড়ির পিটুনি খেতে হবে। তবে অস্ত্রের আকার নেবে এবং পরিশেষে অস্ত্র হয়ে উঠলে রেতের ঘষা খেতে খেতে তীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্র হবে।

নাস্তিকদের আহ্বান করছি

যারা আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করে, যারা মনে করে মৌলভী সাহেবরা আল্লাহ্ বলে একটা নাম নিজের মনমত করে সৃষ্টি করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে তাকে ভাংগিয়ে ডাল রুটি অর্জন করে খায়, আসলে আল্লাহ্ বলতে কিছু নেই, কুর'আন শরীফ হচ্ছে কবির কল্পনা, মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ভাল কবি ছিলেন নবী ছিলেন না, ভাল ভাল রচনাগুলোর নাম কুর'আন শরীফ বলা হয়েছে, কমদামী রচনাগুলোর নাম হাদিস হয়েছে, মূলে এ সবই মিথ্যা কথা (নাউজুবিল্লাহ) এই সব নাস্তিকদের আমি আহ্বান করছি, একটা কথা ভেবে দেখতে।

বিশেষ প্রক্রিয়া ছাড়া বিশেষ কিছু জিনিসের সত্যতা যাচাই করা যাবে না এবং সব জায়গায় শুধু যুক্তি এবং একগুয়েমিতে সমস্যার সমাধান তো হবেই না বরং সমস্যা আরও অবোধ্য হয়ে উঠবে। কাঠি ঘষা না দিয়ে তিন হাজার বিজ্ঞানী এবং নাস্তিক যদি অবিশ্বাস করে যুক্তি শুরু করে দেয় যে, ম্যাচের কাঠিতে আগুন নেই, এটা কি সত্য কথা হবে? পানিতে কাপড় না ভিজিয়ে, শুধু সাবান আর কাপড় হাতে নিয়ে সাবানে কাপড় পরিষ্কার হয় না, ধোয়ার প্রক্রিয়ায় নিয়ে তাকে ধুতে হয়। যুক্তি শুরু করে দিলে কি এটা কোন যুক্তি সংগত কথা বা কাজ হবে? যে জিনিষ যেমন করে সত্য হতে চায়, তাকে তেমন করেই সত্য প্রমাণিত করতে হবে। ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরাতে হলে, তাকে খস করে ম্যাচ বাক্সে একটা ঘষা দিয়ে দিলে অমনি আগুন জ্বলে উঠবে এবং ঘষাটা ঠিক নিয়ম মাফিক দিতে হবে। আস্তে দিলে আগুন জ্বলবে না, জোড়েই দিতে হবে। ঠিক তেমনি কাপড় ভিজিয়ে তাতে সাবান লাগিয়ে খচা দিলে কাপড় কোথা দিয়ে যে পরিষ্কার হয়ে ওঠবে টেরও পাওয়া যাবে না। মানব দেহে যে আশ্চর্য একটি যন্ত্র-যার নাম ক্বল্‌ব, যেটা সুপ্ত হয়ে রয়েছে একে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাষ করলে ম্যাচের কাঠির মত এতে আল্লাহ্র জিকির দিয়ে ঘষা দিলে, কাপড়ে সাবান লাগানোর মত আল্লাহ্র মহানাম দিয়ে ভিজিয়ে আপ্লুত করলে, কখন এতে আল্লাহ্ জেগে উঠবেন তা টের পাওয়া যাবে না। পরীক্ষা না করে যারা মুখে মুখে ক্বল্‌বের শক্তির মহাসম্ভাবনাকে অস্বীকার করে তাদের মাথায় স্বাভাবিকতায় গোলমাল রয়েছে। পরীক্ষা করে কোন জিনিষ সম্বন্ধে মন্তব্য করলে তবে না সঠিক মন্তব্য হয়। আমি এই বইয়ের শেষে একটি প্রক্রিয়া লিখে দিয়েছি। সে প্রক্রিয়া মাত্র চল্লিশ দিন পরীক্ষা করলে, এমনকি কয়েক দিনের ভিতরেও ক্বল্‌ব যে আল্লাহ্র মত একটি গায়েব ধরতে পারে, তার নমুনা প্রকাশ হতে যাবে, যদি ঠিকমত করা যায় (ইন্‌শাআল্লাহ্)।

আল্লাহ্ বলেন, "ওয়া ফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন" (আল-কুর'আন) এবং

আমি রয়েছি তোমার মধ্যে তবু তুমি আমাকে দেখবে না? এখানে পরিতাপ করে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, তবু কি তুমি আমাকে দেখবে না?

আপনি একটা সুস্থ মাথার মানুষ, শুনলেন একটা টাকার মেশিন সরকার আপনাকে দান করেছেন। যত খুশী টাকা ছেপে নিন, আপনাকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। সরকারের নিকট থেকে ধরে নিন আপনার একজন বন্ধু এ মেশিনটা গোপনে আপনার বাক্সে রেখে দিয়েছে, আপনি যখন জানলেন, আপনি এটা একবারও পরীক্ষা করে দেখবেন না? অথচ আপনি খুবই অভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাসৌভাগ্যের আঁধার, টাকার মেশিনের চেয়েও মহাসৌভাগ্যের সম্পদ। এই তো কু'রআন শরীফে শুনলেন, তিনি আপনার নাগালের ভিতরেই আছেন এবং আপনাকে ধরা দেবার জন্য প্রস্তুত আছেন। আপনি কি তার এই কথাটা জীবনে একবারও পরীক্ষা করে দেখবেন না? পরীক্ষা করে দেখে তার পরেই কুর'আনকে অবিশ্বাস করুন, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করুন।

একটি কথা ভাবতে হচ্ছে! আখেরাতে, কোরান, হাদীস, নবী, রসুল, আলেম ওলেমা, সোজা কথায় সবই যদি মিথ্যা হয় এবং আপনার জীবন, আপনার চিন্তাধারা এবং বুদ্ধি-শুদ্ধি যদি মরার পর ঠিক হয়, তবে আপনি বেঁচে যাবেন। কিন্তু স্বয়ং মহানবী (সাঃ) বলেছেন, একজন বেঈমান গুনাগার মরণের পরে কবরে তাকে প্রথম যে আঘাত করা হবে, তার শব্দটা যেখান থেকে বেলা উঠে এবং যেখানে গিয়ে ডোবে এতখানি জায়গা জুড়ে শোনা যায় (মিনাল মাশরেকে ইলাল মাগরিব)। কবরে গিয়ে মরণের পরে যদি দেখা যায়, এই মহাবাণী সত্য হয়ে দেখা দিল, তখন কেমন হবে, ফিরে এসে আর সংশোধন করার সময় পাওয়া যাবে? যদি এ হাদীস মিথ্যা হয় তবে আল্লাহ্ এবং নবীকে অস্বীকার করে কবরে গেলে বাঁচা যাবে। কিন্তু সত্য হতেও তো পারে, কেননা এ পর্যন্ত একটা লোকও মরণের পরে ফিরে আসেনি, কেউ কোন চিঠি কবর বা শশ্মান থেকে লেখেনি। হাদিস কু'রআন কি মিথ্যা? এই মর্মে কোটি কোটি মানুষ মরেছে কিন্তু কেউ ফিরে এসে সাক্ষ্য দিয়ে বলেনি যে, কুর'আন-হাদিস, নবী-রসূল মিথ্যা, মৌলভীরা আল্লাহ্‌র নাম ভাংগিয়ে খায়। চীন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি মানুষ মরেছে, কিন্তু এ যাবৎ একটা মানুষও কি ফিরে এসে বলেছে, মদিনার নবীর কথা এবং আল্লাহ্‌র কথা, মরে পরীক্ষা করে দেখে এলাম সবই মিথ্যা, সব হেয়ালী! তাহলে মরণের পরে যদি সত্যই গোনাহগারদের জন্য কঠোর আজাব থাকে, তবে এত করে শুনেও এত মানুষকে ধর্ম-কর্ম করতে দেখেও এত অনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ এবং রসূলকে অবিশ্বাস করে মার খাওয়ার এত বড় একটি মহা ঝুঁকি (Risk) নিয়ে মরণ বরণ করাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়? যদি মানুষের স্রষ্টা মানুষকে তার সারা জীবনের হিসাব নিকাশ চেয়ে বসেন, যদিই বা কপালে আগুন লেগে যায়, তাহলে সংশোধনের তো আর উপায়ই থাকবে না। মৃত্যু অমোঘ। বিজ্ঞানীরা বলেন, দেহের কোষগুলো এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এগুলো চিরদিন টিকে থাকবে না, কোন এক সময় এরা স্তিমিত হয়ে নিস্প্রভ হয়েই যাবে। ঠান্ডা হয়ে যাবে ধমনী এবং শিরার উষ্ণ রক্ত, স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরতরে হৃদপিন্ডের স্পন্দন, দেহ থেকে মন একদিন পলাতক হবে, নিবে যাবে চোখের রোশনাই।

মরণ যদি সত্যিই সত্য হয়, তবে জীবনকে মরণ থেকে আলাদা করে দেখা সমীচীন নয়। জীবনই একদিন মরণকে ডেকে নিয়ে আসবে। কর্মই একদিন বিরতির ঘন্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত করবে। যেদিন মানুষের জন্ম হয়, মৃত্যুর খাতায় একটি নতুন নাম সংযোজিত হয়ে যায়। তাই কবি বলেন,

জীবন বলিছে, ওরে মানুষ রাখিব তোমারে ঘিরে,
মরণ বলিছে, নিয়ে যাব তোরে মরণ সাগর তীরে
যেখানেই তুমি থাকবে মানুষ, যত হও সাবধান
মরণ তোমাকে ধরে নিবে ঠিক, পাবে না পরিত্রাণ।

যে বিশ্বাস করে ঠকেছে, তার সান্ত্বনা আছে আর যে অবিশ্বাস করেছে তার হাতে অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই নেই। আল্লাহ্ যদি সত্য না হন এবং দুস্কর্মের জন্যে অনুতপ্ত আত্মার যদি মরণের পরে কোন হিসেব পাতি না থাকে, কোন শাস্তি না থাকে তবে ভাল। কিন্তু যদি কোন শাস্তি বা অসংশোধনীয় দুঃখ থাকে, তবে মরণের পরের পাতা তো আর উলটিয়ে দুনিয়ায় সংশোধনের জন্য ফিরিয়ে আনা যাবে না। নিজের মনের বিশ্বাসে **প্রমাণহীন, পরীক্ষাহীনভাবে এত বড় একটা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে কি দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে কবরে যাওয়া উচিত?**

বিজ্ঞানের কি তৃতীয় বন্ধনী শেষ হয়ে গেছে? বিজ্ঞান কি বলে? বিজ্ঞানীর ভাষায় বিজ্ঞানের উন্নতির শেষ নেই। আজকের সত্য থিওরি কালকে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কত শত থিওরি স্থির সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেয়া হয়েছে। যেমন গতি সৃষ্টি না করে দিলে জড় পদার্থ গতিশীল হয় না। দু'চারটে থিওরি স্থির সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিলেও হাজার হাজার থিওরি আজও ভবিষ্যতের অনুসিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে। এভাবে কত সীমাহীন আবিষ্কারের সম্ভাবনা যে রয়েছে, আজকের বৈজ্ঞানিকরা তা ভাবতে পারছে না। কবরের সাপটা ঠিক একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। পরমাণু-মানুষকে একটা অলক্ষ্য সাপ নির্ঘাতভাবে দংশন করবে এবং মানুষ মরণে ধূলি হয়েই যাক, আর পানিতে মিশে সাগরেই তলিয়ে যাক, এ সাপের দংশন জ্বালা থেকে দংশন খাওয়ার উপযুক্ত পরমাণু-মানুষগুলো কোনভ-াবেই রেহাই পাবে না। মোটা চোখ আর মোটা জ্ঞান দিয়ে স্থুল ভাবনা ভেবে সূক্ষ্মকে

বোঝা যাবে না। ধান, পাট আর সরিষা মাপার মোটা বাটখারায় কোনদিন অণুর ওজন মাপা যাবে না। পেরেক দিয়ে জ্বরের ঔষধ ইনজেকশন করা যাবে না। দৈহিক স্থুল জগতের বাইরে ইন্দ্রিয়লব্ধ ত্রুটিসম্পন্ন জগতের বাইরে অন্য একটি সূক্ষ্ম জগত আছে, যেখানে জ্ঞান অচল, অভিজ্ঞতা সচল, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান অন্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ। ইন্দ্রিয় গোলামের মত। এটি মালিককে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল তথ্য পরিবেশ করে। যেমন– অন্ধকারে চোখে রশি দেখে সাপ বলে জ্ঞানকে ধরিয়ে দিয়ে প্রাণ চমকিয়ে হার্টের ব্যাধি ধরিয়ে সর্বনাশ করে দিতে পারে। সাধনালব্ধ আত্মিক জ্ঞান যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিচ্যুতিসম্পন্ন জ্ঞান দিয়ে যারা এ কথা মানতে চায় না বা মানেই না, তারা নিশ্চয়ই জানেই না, আসলে যা সত্যিকারের জানার প্রয়োজন ছিল। ছারপোকার জ্ঞান রক্ত চুষে খেতে যতটুকু প্রয়োজন তাই। অধিকাংশ ক্ষুদে জ্ঞানীর জন্য ছারপোকার নীতিই আসল নীতি। জন্মান্ধকে কোনদিনও ভোরের সোনালী আকাশের সৌন্দর্য বোঝানো যাবে না। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কতটুকু? বিশ্বে সবার ওপরে অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। অনন্ত সম্ভাবনাশীল এ মানুষ। মানুষের মাথাটার এত ধারণ ক্ষমতা আছে যা বিশ্বের কোন সৃষ্টির নেই। যারা শুধু দৈহিক শক্তি বিশ্বাস করে, দৈহিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে যারা বিশ্বাসী, তারাই আসলে নিজেকে অবিশ্বাস করে, সম্পূর্ণ না হলেও অন্ততঃ আংশিক অবশ্যই কেননা দৈহিক জ্ঞান মাপের বস্তু সামগ্রী হচ্ছে মাথা, আর তার গুণাবলী। সেই বস্তু **মাথায় অনুশীলন করে যে মানুষ দেখতেই পাচ্ছে মানুষ কত উচ্চ মার্গে চড়তে চড়তে দুনিয়ার সীমানা পেরিয়ে, চন্দ্রের নাকের ওপর দিয়ে অবতরণ করে সেখানে মাথার বুদ্ধির ছাপ পুঁতে দিয়ে এল, সেই মানুষ কি ভুলেও একবার চিন্তা করে দেখে না, তার মাথায় আরও কোন উচ্চতর ও জটিলতর সম্ভাবনা ছিল কি না**। তার জ্ঞানের বাইরে আবিষ্কারের আওতার বাইরে এখনও অনেক অনেক কিছুই রয়ে গেছে। সর্বপ্রকার জ্ঞানই জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান করা যাবে না। প্রসব ব্যথা, সাপের দংশন জ্বালা, বিচ্ছেদ-বেদনা, মা হবার ব্যথা ইত্যাদি কোনদিনই জ্ঞানে বা যুক্তিতে বা মাপকাঠিতে ধরা পড়ে না। মানুষের ভিতরে আর একটা মানুষ আছে– সে-ই এসব অনুমান গোচর করে। মরণের পরের অধ্যায়টা বা কবরের শাস্তি বা স্বস্তি এবং আল্লাহ্ এমন একটা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানবহির্ভূত ব্যাপার, যা বিশেষ এক প্রকার চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আত্মিক জগতে ধরা পড়বে, জ্ঞানে ধরা পড়বে না। **পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে আরও একটি ইন্দ্রিয় মানুষের আছে, যা অতি সূক্ষ্মতম বা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানবহির্ভূত, যা শুধু সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।**

এই সাধনালব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-আয়নায় এমন সব অভূতপূর্ব জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে, যা মানুষ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দিয়ে কোন দিনই অবলোকন করতে পারে না। যেমন– এই বইটি পড়তে পড়তে যদি কেউ ঢাকার সদরঘাট কল্পনা করে, এ কল্পনা শুধু কল্পনাই থাকবে, বাস্তবে সদরঘাট দেখা যাবে না। সদরঘাটে অজস্র লোকজনের বিপুল ভীড়,

যানবাহনের দারুণ হুড়োহুড়ি ইত্যাদিই কল্পনায় ভেসে উঠবে। এই যে কল্পনায় সদর ঘাটের এক হৈ হুল্লোড়ের ছবি সে কল্পনা করছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না, যদি এমন হোত, সদর ঘাট **কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই বাস্তবে সদর ঘাটের পূর্ণ ছবিটা ঐখানে দেখলে স্বচক্ষে যা এবং যেভাবে দেখা যেত, দূরে থেকে কল্পনা করলেও সংগে সঙ্গে ঐ রকম কল্পনাকে বাস্তবের চোখে দেখা যেত, বিজ্ঞান কি তাহলে এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারত? বিজ্ঞান শিশু, বিজ্ঞানের আজও দুধের দাঁত পড়েনি, বিজ্ঞান ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় দু' একটা আধো আধো কথা বলতে কেবল শিখেছে মাত্র। বিজ্ঞান শুধু বুদ্ধিতে বিশ্বাস করে, ইন্দ্রিয়লব্ধ ত্রুটির জ্ঞানে বিশ্বাস করে, আছাড় খাওয়ায় বিশ্বাস করে**। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতে বড় রূঢ় মন্তব্য করা আমার ধৃষ্টতা, তা জানি। কিন্তু যে মাথা খাটিয়ে বিজ্ঞানের মাথা পাওয়া যায়, সেই জটিল মাথাটা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মাথাটা কতই না জটিলতম হতে পারে! তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বাইরে আরেকটি জ্ঞানের উল্লেখ করে গোটা মানব জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, "ওয়া আল্লামনাহু মিল্লাদুন্না এলমা" (আল-কুর'আন)।

এবং **আমি মানুষকে দিয়েছি ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অতিন্দ্রিয় জগতের একটা সূক্ষ্মতম জ্ঞান**, যা যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করা যাবে না। সেটা সবার ওপরের জ্ঞান, সবার উপরে তথ্য, যা শুধু সাধনায় ধরা পড়বে। এই জন্য বলা হয় **"যাকে তোমরা জ্ঞান বল, সে তো জ্ঞানের অত্যন্ত প্রাথমিক হাতে খড়ি। আসল জ্ঞানইতো হচ্ছে ধ্যানে। সুতরাং জ্ঞান-জ্ঞান, ঘ্যান-ঘ্যান না করে ধ্যান করতে শেখ"**।

উপরোক্ত মহাবাণীতে একটা নতুন জ্ঞান, সম্পূর্ণ একটি অভিনব জ্ঞানের কথা, বিদ্যার কথা, যা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করা যাবে না, উল্লেখ করা হয়েছে। অবিশ্বাসী জড়বাদী হৃদয় কি কোনদিন কোন কালে দু'চার ঘন্টার জন্যও দয়া করে এ পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, কথাটা সত্য না মিথ্যা? আপনি যা ভাবেন তাই যে শুধু সত্য, অন্য কোন সত্য আর সত্য নয়, এটা কি মানুষের কথা না জন্তুর বিবেচনা?

কবরের আজাব চোখে দেখা যায় এবং আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করা যায়

মরনের পরে কর্ম অনুযায়ী কবরে আজাব বা শাস্তি হয়। যে সব জড়বাদীরা বা তার্কি-করা একথা অবিশ্বাস করে, তাদের সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে যে, সব সমস্যার সমা-ধান জ্ঞান খাটিয়ে সমাধান করা যায় না বা যুক্তিতে সব কিছু ধরা পড়ে না। কোন সমস্যার সমাধান করতে সে যে ভাবে চায়, সে ভাবেই তাকে সমাধান করতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে বা গা দিয়ে ঘা মেরে বা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অথবা নিজের রুচিমত থিওরির গুলি মেরে দিয়ে তাকে সমাধান করা যাবে না।

অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হচ্ছে নিজে যা বোঝে তাই সে সবার ওপরে বড় মনে করে এবং শুধু তাই নয় এই কোণঠাসা বুঝ নিয়ে সে নিজেকে একজন জ্ঞানী মনে করে, বিস্তর অজানা অথচ সত্যকে অস্বীকার করে বহাছ শুরু করে দেয়। তাইতো জ্ঞানীরা বলেন, যে বলে, 'আমি অনেক কিছুই জানি', আসলে সে কিছুই জানে না এবং যে বলে, 'আমি কিছুই জানি না', সেই হচ্ছে জ্ঞানী। কারণ **সে অনেক অজানা যে বিশ্বের বুকে রয়েছে এবং অজস্র বিদ্যা রয়েছে, তা সে জানে না। সে অনেক জানে না একথা উপলব্ধি করেছে বলেই সে বলে, আমি জানি না অর্থাৎ বিশ্বের সবার ওপরে জ্ঞানী লোকেরও জ্ঞানের বাইরে অনেক কিছুই আছে, যা একজন জানে, অন্যজন জানে না এবং একথা যে মানে না সে কূপমন্ডুক, সে আত্মকেন্দ্রিক। সে নিজেকেই শুধু মানে, অন্যকে মানে না।**

এক প্রকার সত্যের চেয়ে অন্য প্রকার সত্য যে সত্য, যদিও সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই সত্য হতে পারে, একথা সত্য অস্বীকারকারী একগুয়ে লোকের সত্যের চেয়েও বড় সত্য। পেটের ভিতরের তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে যদি কেউ এক থালা ভাত পেটের চামড়ার ওপরে জাম করে বেঁধে রাখে এবং যুক্তি করে বলে যে, পেটের ওপরেই তো একেবারে খাদ্যের বোঝা চাপানো আছে তবে কেন ক্ষুধা মিটবে না। এটা কি একটা জ্ঞান সম্মত কথা হলো?

পেটটা বেজায় রকম গন্ডগোল করছে, পরিষ্কার হচ্ছে না-তা বলে কাপড় কাঁচা সাবান যদি নাভীর ওপর পালিশ করে মালিশ করা যায় অথবা সাবান গোটা তিনেক খাওয়া যায় তবে আরও বিপরীত ফল হবে। আখেরাতের ব্যাপারটা ঠিক এমনি। কবরের আজাব এবং আল্লাহ্ সত্য কিনা তা যুক্তি দিয়ে জ্ঞান খাটিয়ে কিছুতেই সম্যক ধরা যাবে না, হয়তো আঁচ করা যাবে, সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না।

যে সমস্যা যেভাবে সমাধান চায়, তা-ই করতে হবে এবং তা করতে হবে যুক্তিহীনভ-াবে শিশুর মত। যেমন– এক খন্ড খাঁটি চুম্বক কিনতে হলে বিলেত পাসের সার্টিফিকেট ওতে ঠেকালে বা একটা ভাল চম চম মিষ্টি বা বিজ্ঞানীর মাথা ওতে ঠেকিয়ে ঘষে পরীক্ষা করলে কখনও চুম্বক খাঁটি বা অ-খাঁটি পরীক্ষা করা যাবে না। চুম্বক পরীক্ষা করতে হলে, ওর যথার্থতা পরীক্ষা করে নিতে হলে, নিশ্চয়ই ও যা দিয়ে পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে, তা-ই দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে হবে।

একটু লোহার হাল্‌কা টুকরো দিয়ে পরীক্ষা করা ছাড়া বিশ্বের যে কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি বা ডিগ্রী দিয়ে ওকে পরীক্ষা করা যায় না। ঠিক আল্লাহ্‌ও এমনি একটা ব্যাপার যা কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের থিওরি খটিয়ে বা অযথা যুক্তি তর্ক দিয়ে পূর্ণ ঠাওর করা যাবে না এবং এ ব্যাপারে গা ধাক্কিয়ে, যুক্তির গুলি মেরে কবরের শাস্তি বা স্বস্তি উপলব্ধি হবে না।

প্রতিটি জিনিসের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, তার ধর্মের রীতিনীতি দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হবে। পানি কি তা বুঝতে হলে, তাকে আবিষ্কার করতে হলে, ওর মৌলিক পদার্থের অনুসন্ধান করে যে পথে অনুশীলন করলে পানি একাই সৃষ্টি হবে, সেই পথেই এগুতে হবে, অন্য কোন জ্ঞানে বা পদ্ধতিতে নয়। যেমন পানিকে আবিষ্কার করতে হলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সাহায্য নিতে হবে, তড়িতের সাহায্য নিতে হবে। শুধু তাই নয়, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত (Ratio) ঠিক রাখতে হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ কি এবং মানুষের কবরের আজাব বা শাস্তি বুঝতে হলে একটা ধারা বা নিয়ম আছে। সেই নিয়মে কিছু দিন খাটা-খাটুনি করলে উপলব্ধি করা যাবে যে, মানুষের মরণের পরে কি ঘটে?

চোখে দেখা যাবে না বা যায় না বলে কোন অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে মুর্খ-তাই হবে। খালি চোখে শূন্য মাঠের দিকে তাকালে বা ঘরের ভিতরে তাকালে কোন গান বা ছবি নজরে পড়ে না। তাই বলে বাতাসে গান বা টেলিভিশনের ছবিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা কি অস্বীকার করা যাবে? কিন্তু শূন্য স্থানে ছবি থাকতে পারে, চোখের সামনে একেবারে চোখের মণি ছুয়ে একটা নারী মূর্তি নেচে নেচে বিরাজমান থাকতে পারে, কেই বা আগে বিশ্বাস করতো। এখন একটা রেডিও বা টেলিভিশন থাকলেই শূন্যের গান বা ছবি ধরতে পারা যাবে। এটাই খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, এই শূন্যের ভিতরে গান আছে একথা কেউ কি কোন কালে বিশ্বাস করত? কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ কঠোর সাধনা করে, নাই-এর ভিতরে আছে-এর কল্পনা করে, নাই যে 'নাই' নয় 'নাই'-এর ভিতরেও যে 'আছে' আছে তার প্রমাণ করে গিয়েছেন এবং তারা সাধনা না করে শুধু জ্ঞান-জ্ঞান ঘ্যান-ঘ্যান করেননি, ধ্যান করেছিলেন অর্থাৎ হাইপোথেসিস করে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারা বাতাসের ভিতরে গান থাকতে পারে– এই কল্পনাটা হয় নিজেরা করেছেন অথবা শুনে এর যথার্থতা পরীক্ষা করবার জন্য কার্যক্ষেত্রে একনিষ্ঠ হয়ে নেমে পড়েছিলেন।

এতগুলো কথার অবতারণা করার আসল অর্থ এ নয় যে, মরণের পরে কবরের আজাব এবং আল্লাহ্ বলতে একটা মিথ্যে ভয় দেখিয়ে কাউকে কোণঠাসা করার প্রয়াস পাওয়া। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আসলেই আল্লাহ্, কবরের আজাব বা শাস্তি সরাসরি চোখে, সরাসরি যুক্তিতে এক কাপ চা পান করার মত বা কিছু থিওরি-টিওরির ফরমূলায় ফেলে একটা হিসাব-পাতির নিরসন করার মত খুব সহজে এবং যেন-তেন প্রকারেও বোঝা যাবে না। মরণের পরে মানব জীবনের অধ্যায়টা বুঝতে হলে, আল্লাহ্, কবরের আজাব আবিষ্কার করতে হলে, ঐ পানি আবিষ্কারের মত একটা বিশেষ নিয়মে, বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

অ, আ থেকে নজরুলের কবিতা বুঝতে যেমন ক্রমিক ধারা অনুযায়ী পড়ে যেতে হয়, এখানেও তাই করতে হবে। আর একটা কথা না বললেই নয়। লেলিন, ষ্টালিন, মার্কস, হেসেল ল্যামার্ক, ডেকার্ট, পাভলভ, কান্ট, বার্কলি, ফ্রয়েড, মরগ্যান, আইনষ্টাইন প্রমুখ মনীষীরা যা বলেছেন বা থিওরি দিয়েছেন, জ্ঞানের অনুসারী হিসাবে সকলেই তা গ্রহণ করলেন, পরীক্ষা করে দেখলেন। বড় বড় মনীষীদের থিওরি পরীক্ষা করে সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করার যোগ্যতা অর্জন করতে আপনাকে কতদিন কঠোর শ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জ্ঞান অর্জন করতে জ্ঞানই জ্ঞানীকে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে একমুখী করে যে রাখে, ক্ষুদে জ্ঞানী তা টের না পেয়ে এক তরফা বিবেচনা করতে করতে একাই এক তরফা বিষয়ক ত্রুটির শিকার হয়ে অন্ধত্বে এবং কূপমন্ডুকতায় ভুগে মরে।

আইনষ্টাইন, লেলিন, মার্কস প্রমুখ মনীষীগণ যেমন থিওরি দিলেন, তারা যেমন মানুষ ছিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও একজন মানুষের নাম। তিনিও তো একজন যুগস্রষ্টা মহামানব ছিলেন। বিভিন্ন মনীষীদেরকে যেমন মানুষ মনে করুন- তাদের মত তিনিও একজন মানুষ। তিনি নবী ছিলেন বিশ্বাস নাইবা করলেন। মানুষ হিসেবে তো তিনি বিশ্বজোড়া সবার ওপরে একজন খ্যাতি সম্পন্ন মানুষ। সকল মানুষের দেয়া থিওরি এত দীর্ঘ দিন শ্রম স্বীকার করে, লেখাপড়া করে, গবেষণা করে অন্ধ কোঠায় আটকে থেকে, প্র্যাকটিক্যাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই যে একজন মহামানুষ যে থিওরিগুলো দিলেন জীবনে কেন কোন দিনও তো একবার পরীক্ষা করে দেখলেন না? এক তরফা বিবেচনা কি ভাল, পক্ষপাতিত্ব, কি শিক্ষার কথা? পরীক্ষায় না টিকলে, তার কথা ফেলে দিলে অথবা তাকে মন্দ বললে ক্ষতি হত না।

তিনি বলেছেন, কবরের আজাব সত্য এবং আল্লাহ্ সত্য। আপনি কি এই ছোট অথচ মহাসমস্যাপূর্ণ থিওরিটি ভুলেও একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে, এটা ভুল কি শুদ্ধ সঠিকভাবে সাব্যস্ত করে দেখেছেন? একজন এম. এস-সি, পাস লোকের কথা বুঝতে

কমপক্ষে আই, এস-সি, পর্যন্ত বার বছর শ্রম স্বীকার করতে হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটা মহাবিদ্যার স্পষ্ট থিওরি দিলেন, আপনি কতদিন পরিশ্রম করেছিলেন তার থিওরিটা বুঝবার জন্য?

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অন্যান্য মনীষীদের মত শুধু মানুষ মনে করলে ভুল হবে, কারণ তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের একজন মনোনীত শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন, যাঁর ওপরে পবিত্র কু'রআন শরীফ নাজিল হয়েছিল। তিনি আরো বলেছেন, কোন মানুষ যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের জিকির বা স্মরণ করেন তখন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তার সামনে বসে থাকেন এবং তার জবাব দেন।

আপনি কি কোনদিন এই বিষয়ের কোন ওস্তাদ বা শিক্ষকের কাছে গিয়ে তার কথামত চেষ্টা করে দেখেছেন এ মহাথিওরিটা? এই বইয়ের শেষে সবকের অধ্যায়ে এক প্রক্রিয়া লিখে দেয়া আছে, আপনি মাত্র সাত দিন বা একুশ দিন বা চল্লিশ দিন ঐ প্রক্রিয়া মত চেষ্টা করে দেখুন, ইনশা-আল্লাহ্ আপনি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের ডাকের জবাব এবং অস্তিত্বের প্রমাণ পাবেন।

আল্লাহ্, রাসূল (সাঃ), কবরের আজাব এবং আখেরাত সত্য কিনা তার ফলিত প্রমাণ

মরণের পর মিশে যাওয়া মানুষটার কিভাবে কবর আজাব হয়, কিভাবে অনন্তকাল একটা মানুষকে সাপে কামড়াবে, কিভাবে কবরে মোনকার-নাকির ফিরিশ্‌তারা গুর্জ মারবে এবং সত্যই জাহান্নাম বা দোজখ বলতে কিছু আছে কি না, বেহেশ্‌ত সত্য কি না, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কি সত্যই নবী ছিলেন, না কবি ছিলেন এবং সবার ওপরে আল্লাহ্ বলতে একজন আছেন কি না-এ সব পরীক্ষা করে সত্য পেতে হলে আজকে থেকে পরীক্ষায় নেমে যান। এই বই টেবিলে সরিয়ে রাখুন। আপনার লেখাপড়ার স্থানটি যেমন নিরালাতে করেছিলেন, একটা চেয়ার একটা টেবিল দিয়ে সাজিয়েছিলেন-ঠিক এ বেলায়ও একটা নিরালা স্থান খুঁজে নিন, সেখানে কেউ যেন আপনাকে না দেখে। একটা পরিচ্ছন্ন বিছানা বিছিয়ে নিন। তারপর নিম্নের প্রক্রিয়ায় কাজ আরম্ভ করুনঃ

আল্লাহ্‌কে চেনার বিশেষ প্রক্রিয়া

চক্ষু বন্ধ করে বসুন। কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখুন। এখন মন খুব স্থির করে মৃত্যুর ভাবনা ভাবুন। মনকে প্রশ্ন করুন, মন তুমি মরবে কিনা? মন উত্তর দেবে, মরব। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করুন, মরে তুমি যাবে কোথায়? তোমাকে কি ঘরে রাখবে, না কবরে? মন উত্তর দেবে, কবরে। তৃতীয় প্রশ্ন করুন, কবরে তোমার কে বান্ধব হবে? মন উত্তর দেবে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বান্ধব নেই। এই কয়টা প্রশ্ন এবং উত্তর খুব নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ সহকারে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। এরপর একটা লোক মরণ থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের ওপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটিয়ে নেবেন। খুব নিবিড়ভাবে খেয়াল করবেন, আমি এখন মরে গেলাম। আমাকে চারজন লোকে ধরাধরি করে দুয়ারে বার করে। এখন আমাকে গোসল দেয়। খেয়ালের নজরে দেখবেন, গোসলের পানিটা দুয়ারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, আপনার অবুঝ সন্তানেরা সেই পানিতে খেলা করে। আপনার বিবি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। চোখের পানিতে সে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে, আপনাকে এপিঠ ওপিঠ করে গোসল দেয়া হচ্ছে। এবার আপনার জন্য কাফনের কাপড় এনে পাশে রাখা হ'ল। এখন আপনাকে কাফন দেয়া হচ্ছে। এখন কাফনে মোড়ানো আপনি দুয়ারে অসহায় হয়ে শুয়ে আছেন আসমানের দিকে মুখ করে। এখন আপনার বিধবা বিবি অঝোর নয়নে আপনার কাফনের দিকে চেয়ে কাঁদছে। খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনার বিধবা বিবিকে হাতের চুড়িবিহীন অবস্থায় দেখলে কেমন মূর্তি দেখা যায়। এসব কল্পনা করলে দেখবেন, দিলটা নরম হবে, তখন নিম্নের সবক অর্থ ভাল করে খেয়াল করে বলতে থাকবেন।

সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন লাভের কয়েকটি সাধারণ বিধি

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এ প্রবাদ বাক্যটি জানা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অসুস্থ হয়ে যায় কেন? এর কতগুলো বুনিয়াদী কারণ আছে। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে তার দ্বারা দুনিয়া এবং আখেরাতের কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, **যদি তুমি বেহেশ্‌তি লোক দেখতে চাও, তবে যার স্বাস্থ্য উত্তম তাকে দেখ (স্বাস্থ্যকে যে সৎ পথে খাটায়)। আর যদি জাহান্নামী লোক দেখতে চাও, তবে যার স্বাস্থ্য ভাল তাকে দেখ (স্বাস্থ্য যে গোনাহর পথে ব্যয় করে)।**

সংক্ষেপে কয়েকটি নিয়ম নিম্নে লিখে দেয়া হল। এগুলো পালন করলে সর্বব্যাধির হাত থেকে ইন্‌শাআল্লাহ্ রেহাই পেয়ে উত্তম স্বাস্থ্যে দীর্ঘ জীবন যাপন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

১। ফজরের নামাজের জন্য অজু করে অজুর অবশিষ্ট পানিটুকু পান করা। মেহ, প্রমেহ, ব্যাধি (কষা ব্যাধি থাকলে) ঐ পানি একটু বেশী পরিমাণ পান করা। এটা বহু-ব্যাধির ঔষধ।

২। ভোরে ত্রিফলা পানি পান করা সর্বব্যাধির জন্য উপকারী। তিনটি হরিতকী, তিনটি বহেরা এবং সমপরিমাণ আমলকী সন্ধ্যায় আধা সের পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে চটকিয়ে ছেঁকে ঐ পানি ধীরে ধীরে পান করতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে ৩ থেকে ৬টি বা ৮টি হরিতকি অবস্থা অনুযায়ী মেশাতে হবে। হরিতকী এবং বহেরার বীজ ফেলে দিয়ে শুধু ছাল নিতে হবে– বড় হরিতকী, ছোট হরিতকী নয়।

৩। পেটই হচ্ছে সর্বব্যাধির কেন্দ্র। পেট পরিষ্কার থাকলে সহসা কোন ব্যাধি তাকে আক্রমণ করতে পারে না। এ মর্মে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সর্বব্যাধির মূল অজীর্ণ এবং অজীর্ণের মূল বেশী খাওয়া। কাজেই সর্বদা পেটে ক্ষুধা রেখে খেতে হবে। পূর্ণ ক্ষুধা না থাকলে খাওয়া পাকস্থলীতে কুড়াল মারার সমান।

৪। অতি উত্তমরূপে চিবিয়ে খেতে হবে। একটা কথা আছে Eat liquid and drink solid— অর্থাৎ তরল পদার্থ খাও এবং শক্ত খাদ্য পান কর।

৫। মুড়ি, চিড়া, গরম ভাজা জিনিষ, গরম রুটি, গরম, গোশত, খুব গরম চা, অতি ঠান্ডা পানি, বরফ পানি, দৈনিক ভোরে ঠান্ডা পানি পান করা, ঘুম থেকে উঠেই ঠান্ডা পানিতে গোসল করা নিষেধ।

৬। বৈদ্যুতিক পাখার নীচের হাওয়ায় ঘুমানো বিষের মত।

৭। অমনোযোগী হয়ে খাওয়া, হায়াৎ কমের লক্ষণ। মানুষের মোকাবেলায় খাওয়া নিষেধ।

৮। ঝাল বেশী খাওয়া একটা ব্যাধি। শুকনা মরিচ কম খেয়ে কাঁচা মরিচ খাওয়া ভাল। যাদের অর্শ্ব ব্যাধি আছে, তারা নিয়মিত ত্রিফলা খাবে। ভাত দিয়ে দৈ দিয়ে মাখিয়ে খাবেন। প্রচুর ডাব খাবেন। মাথা চড়া থাকলে শুকনো খাবার খাওয়া নিষেধ। ঝোল জাতীয় খাবার বেশী খাবেন। গরুর গোশত খেলে অবশ্যই প্রচুর দৈ ডাব না খেলে নানা রকম অসুবিধা হতে পারে।

৯। মানুষের দৈহিক সৃষ্টি গঠনই এমনভাবে করা হয়েছে যে, এটা দৈহিক শ্রমকে ভালবাসে। এজন্য সকাল-সন্ধ্যায় কমপক্ষে দেহে ঘাম না হওয়া পর্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। শারীরিক পরিশ্রম না করা বহু ব্যাধির কারণ, বিশেষ করে যারা বুদ্ধিজীবী, তাদের জন্য পরিশ্রম সালসা তুল্য কাজ করে।

১০। রাতে শোবার সময় ওজু করে ওজুর শেষ পানিটুকু একটু বেশী করে খেয়ে শুয়ে থাকলে, স্বপ্নদোষের ব্যাধিতে আক্রমণ করে না। তালমাখনা মধুতে মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় খেয়ে, সবরী কলা নিয়মিত খেতে থাকলে এ ব্যাধির উপশম হয়।

১১। রাত্রিতে শোবার সময় ওজুর পানিপান করে চোখে অনেকক্ষণ পানির ঝাপটা দিয়ে শুয়ে থাকলে, বহু প্রকার চক্ষু ব্যাধি থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়। দিনে পাঁচবার ওজুর সময় ঝাপটা দেয়া আরও ভাল।

১২। সকালে না খেয়ে থাকা বহু ব্যাধির উৎসের কারণ। সকালে চা, রুটি, ভাজা জিনিস, গোশ্‌ত এগুলো খাওয়া ঠিক নয়।

১৩। শোবার সময় প্রথমে চিৎ হয়ে পরে ডান কাত হয়ে ঘুমাতে হয়। নরম বিছানায় ও নরম বালিশে শোয়া খুব ক্ষতিকর। নরম বিছানায় শুলে শরীর শিথিল হয়ে যায়। দৈনিক ৮ ঘন্টা ঘুমালে প্রাপ্ত বয়স্কদের শরীর একেবারেই ঢিলা হয়ে যাবে। কোমড় ব্যথার প্রধান কারণ বেশী ঘুমান। বেশী ঘুমালে হৃদপিণ্ড দুর্বল হয়।

১৪। পেটের পীড়ায় ডাল, গোশ্‌ত, কচু, চিংড়ি মাছ, দিনে ঘুম, রাত জাগা, শাক, টক মারাত্মক।

১৫। চেঁচিয়ে কথা বলা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অযথা কথা বললে আমলনামা ভারী হয়, গোনাহ হয়। চেঁচিয়ে কথা বলা মানুষ থেকে সাবধান থাকতে হয়, কারণ সে ভদ্র নয়– একথা লোকমান হাকিম বলেছেন।

১৬। ঐ অসুখ সবচেয়ে মারাত্মক, সে অসুখকে ছোট মনে করে কোন চিকিৎসা করা হয় না। বিশ্ব বিখ্যাত হেকিম বোকরাত একথা বলেছেন।

১৭। কু-সংগ সবচেয়ে বড় ব্যাধি। যাদের কু-স্বভাব আছে, তাদের সংগে মেলামেশা করা একটা বড় ব্যাধি।

১৮। ঠান্ডা লাগা থেকে শতকরা ৮০ ভাগ অসুখ হতে পারে। একজন জার্মান বিজ্ঞানী এ কথা বলেন। ঠান্ডা লাগলে অবিলম্বে গোছল বন্ধ করতে হবে। ছোট এলাচি, লবঙ্গ, আদা, বচ, কর্পুর, তুলসী পাতা এবং মধুর কাঁথ খেলে ঠান্ডা দোষ উপশম হয়। অসুখের প্রাথমিক অবস্থায়ই ঔষধ খাওয়া ঠিক নয়।

১৯। ইন্দ্রিয় সংযম, একটা মস্তবড় ঔষধ। শাক খেয়ে সোনার স্বাস্থ্য থাকবে, যদি শাক দেহে রক্ষা পায়, আর ঘি-পোলাও খেয়ে স্বাস্থ্য বিনাশ হবে, যদি দেহে ঘি রক্ষা না পায়।

২০। যৌন ব্যাধি ও ইন্দ্রিয় দুর্বলতার প্রধান ঔষধ হচ্ছে বিরতি বা সংযম। স্ত্রীর সঙ্গে ঘন ঘন মেলামেশায় হায়াত কমে যায় এবং তার সঙ্গে এক বিছানায় অনবরত সন্নিকটে রাত্রি যাপন করলে আয়ু কমে যায়– একথা যৌন বিজ্ঞানে বলে। নারীর দিকে কু-নজর করা দেহ ও মনের জন্য মারাত্মক। **মনের বিরুদ্ধে মনকে লাগাম দিতে জানলে দেহ-ঘোড়া দ্রুতগামী হয়।**

২১। ঘরের বিবি বেপর্দায় থাকলে পুরুষের মন কোনদিনও ভাল থাকবে না। ঘরে শুধু ক্যাচ-ক্যাচি সার হবে। বেপর্দা নারী পুরুষের মনের স্বাস্থ্যের বহু ওষুধ নষ্ট করে দেয়। ঐ রকম বেগানা নারীর সঙ্গেও ঘরের শান্তিকে দারুণভাবে ব্যাহত করে। **পর্দা শুধু নারীর জন্যই নয়, পুরুষের জন্যও। নারীর পর্দা বোরকায়, পুরুষের পর্দা মনের দরজায়, চোখের তারায় এবং কাপড়েও।**

২২। ধূমপান ফুসফুসগামী প্রায় দু'শো কোটি অতি সূক্ষ্ম পথে চলতে চলতে এ সূক্ষ্ম পথগুলোকে বন্ধ করে দেয় এবং দু'শো কোটি বায়ু থলের ছাঁকনিকেও বন্ধ করে দেয়। কেননা তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামক বিষ আছে যা মারাত্মকভাবে মানুষের ফুসফুসে ও রক্তকে আক্রমণ করে। ধূমপায়ীর সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে, পুরুষত্বহীন হয়ে যায়। এই বইয়ে যে সবক লিখে দিলাম, যদি কেউ কিছুদিন তা করতে পারেন, এমন কি অবিশ্বাস করেও ঠিকমত করতে পারেন, তবে ধূমপান করতে আর ইচ্ছে করবে না। ফলে মহাসর্বনাশ থেকে বেঁচে যাবেন।

এটি বহু পরীক্ষিত। মদ মানুষের লিভারকে পঁচিয়ে ফেলে, এতে ক্ষতি ছাড়া কোনই গুণ নেই। মাদকাসক্ত ব্যক্তি জাহান্নামের দ্বারে বসে খেলা করে। যে কোন আসক্ত ব্যক্তি এই বইয়ের সবকটি নিয়মিত অভ্যাস করলে, তার সমস্ত কু-অভ্যাস একা একা কোথা দিয়ে কিভাবে যে নষ্ট হবে, তা টের পাওয়া যাবে না। এটা বহু পরীক্ষিত। এই সবকে মনের সর্বশান্তি হবে, এটা মস্ত বড় ব্যায়ামের কাজ করবে। দেহ সুস্থ ও সবল রাখবে। দীর্ঘ হায়াত দান করবে। সবার ওপরে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে দেয়। যাদের দৈহিক অসুস্থতা আছে, তারা দেহ নড়াচড়া করে এ সবক করবে, যে পর্যন্ত দেহে ঘাম না বেরোয়। এতে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

সবক
The Lesson

সবক করার নিয়ম

ভাল উৎপাদন পেতে হলে ভাল ভাবে জমি চাষ করে নিতে হয়, মরণের খেয়াল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাস্তব জ্ঞান (Practical) বা মা'রেফত অর্জনের জন্য জমি চাষতুল্য। হাদিস শরীফে আছে, "আকিছিরুজ জিক্‌রা হাদামুল লাজ্জাত"-তোমরা অধিক পরিমাণে স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর। আরও আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যাক্তি দিনে বিশ বার মরণকে স্মরণ করে, তার শহীদের চেয়েও বেশী নেকী হয় (বুখারী শরীফ)।

সবক আরম্ভ করার পূর্বে প্রথম দিন দু'রাকায়াত শোকরানা নামাজ আদায় করে আল্লাহ্‌র দরবারে যাবতীয় গুনাহ মাফ চেয়ে দো'য়া করবেন। মাবুদ এই গোলামকে আপনি কবুল করে নিন, এই তরিকার সমস্ত নেয়ামত এ গোলামের নছিব করুন। মাগ্‌রিবের ফরজ সুন্নত নামাজ আদায় করার পর, ছয় রাকায়াত আউয়াবিনের নামাজ আদায় করে তারপর শোকরানা নামাজ পড়বেন। শোকরানা নামাজের পরে পাঁচবার দরূদ শরীফ পড়ে মোনাজাত করবেন। তারপর একটা নিরালা স্থানে চক্ষু বন্ধ করে মন স্থির করে বসবেন। বসে নিম্নলিখিত কায়দায় মরণের খেয়াল করবেন।

চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখুন। এখন মন খুব স্থির করে মৃত্যুর ভাবনা ভাবুন। মনকে প্রশ্ন করুন, মন তুমি মরবে কি না? মন উত্তর দিবে, মরব। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করুন, মরে তুমি যাবে কোথায়? তোমাকে কি ঘরে রাখবে, না কবরে? মন উত্তর দেবে, কবরে। তৃতীয় প্রশ্ন করুন, কবরে তোমার কে বান্ধব হবে? মন উত্তর দেবে, আল্লাহ্ বাদে কেহ বান্ধব নেই। এই কয়টা প্রশ্ন এবং উত্তর খুব নিবিড়ভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। এরপর একটা লোক মরণ থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটিয়ে নেবেন। খুব নিবিড়ভাবে খেয়াল করবেন, আমি এখন মরে গেলাম। আমাকে চারজন লোক ধরাধরি করে দুয়ারে এনে রাখে। এখন আমাকে গোসল দেয়। খেয়ালের নজরে দেখবেন, গোসলের পানি দুয়ারের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, আপনার অবুঝ সন্তানেরা সেই পানিতে খেলা করে। আপনার বিবি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে, চোখের পানিতে সে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আপনাকে এপিঠ ওপিঠ করে গোসল দেয়া হচ্ছে। এবার আপনার জন্য কাফনের কাপড় এনে পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কাফন দেওয়া হচ্ছে। এখন কাফনে

মোড়ানো আপনি দুয়ারে অসহায়ভাবে শুয়ে আছেন আসমানের দিকে মুখ করে। এখন আপনার বিধবা বিবি আপনার দিকে চেয়ে অঝোরে কাঁদে। খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনার বিধবা বিবিকে হাতের চুড়িবিহীন অবস্থায় দেখলে কেমন দেখা যায়। এসব কল্পনা করলে দেখবেন দেল (মন) নরম হবে।

সবকে বসার কায়দা

চারজানু হয়ে বসে বাম পায়ের কিমিয়াস রগকে ডান পায়ের বৃদ্ধা ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুল দিয়ে খুব চেপে ধরবেন। বাম পায়ে হাটুর নীচের দিকে যে মোটা রগটা আছে, তাকে কিমিয়াস রগ বলে। এই রগ দিয়ে শয়তান চলাফেরা করে, ঘাড়ের নীচে গোল হাড়ে আশ্রয় নেয়। এই রগটা জোরে চেপে বসলে শয়তানী খেয়াল দূর হয়। এই রগটা চেপে বসলে জেকেরে তাড়াতাড়ি তাছির হয়। মেয়েলোক নামাজের আসনে বসে জিকির করবেন।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য লাভের সবকসমূহ

প্রথম সবক

তারপর যে কোন দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়বেন। এই সময় খেয়াল করবেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর দরূদ পড়ি। যদি পারেন নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পড়বেন

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া নাবিয়েনা ওয়া শাফিয়েনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।"

দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়ার পর 'আসতাগফিরুল্লাহ' এগার বার পড়বেন। যদি পারেন নিম্নোক্ত আসতাগফিরুল্লাহ পড়বেন খেয়াল করবেন, আমি যাবতীয় গুণাহ্ হতে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই।

"আসতাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম"

এরপর হাতে একটা তসবিহ্ নিয়ে পড়বেন

সোব্‌হানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই সময় খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন? হাদীস শরীফে আছে, বান্দা একবার আল্লাহ্‌কে ডাক দিলে, তিনি দশবার জবাব দেন। এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় লফজ মানে খেয়াল না করে প্রতিবারই খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও কেন বা কেন ডাক? এবং প্রতিবারই কানে আল্লাহ্‌র ঐ জবাব শুনতে চেষ্টা করবেন। একদিন ইন-শা-আল্লাহ্ দেলের কানে স্পষ্ট শুনতে পাবেন, আল্লাহ্ কেমন করে উত্তর দেন।

তারপর **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** ৫০০ (পাঁচশত বার)
দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন, **"আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই"**।

"লা" শব্দ বলার সময় মুখখানা ডানদিকে ঘুরিয়ে ডান কাঁধের উপর নেবেন, ডান কাঁধের উপর হতে 'লা' শব্দ উঠাবেন, ইলাহা বলতে বলতে মাথাটা খাড়া রেখে বাম দিকে ঘুরিয়ে আনবেন, নাকটা যখন বাম দুধের বোটা বরাবর আসবে, বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্র ঘর ক্বলব থাকে, তখন খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্লিয়ে আটকিয়ে না যায়। মাথা খুব ঘন ঘন আছাড়-পিছাড় করবেন না শুধু উঠানামা করাবেন মাঝে মাঝে 'মুহাম্মাদুর রাসূল-ুল্লাহ্ (সাঃ)' বলবেন। আর যদি সবকে এস্ক লেগে যায়, তবে একেবারে শেষে কয়েকবার বলবেন। পরে **পাঁচ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত দেবেন। মাগরিব বাদ ছয় রাকাত আউয়াবিন নামাজ আদায় করে এই সবক করবেন, না পারলে এশা বাদ, না পারলে শোবার আগে কোন সময় ওজু ছাড়াও করতে পারবেন, ফজর বাদ আরেকবার এই সবক করে বেলা উঠলে ছয় রাকায়াত এশরাকের নামাজ আদায় করবেন। হাটতে, চলতে, তসবীহ্ ছাড়া, ওজু ছাড়া, আন্দাজে- অনুমানেও এ সবক আদায় করতে পারবেন।

এই সবকের নিম্নমানের তাছির (Result) এই হবে যে, দেল পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা চোখে পানি ঝরবে, লোকের সঙ্গে অযথা আলাপ করতে ইচ্ছে করবে না, গুণাহের কাজে মন যেতে চাইবে না পীরের জন্য মহব্বত বৃদ্ধি পাবে, তাকে দেখতে ইচ্ছে করবে তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগবে আর আখেরাতের চিন্তা মনে ঢুকে যাবে। পুরুষেরা শব্দ করে এবং স্ত্রীলোকেরা নিম্ন স্বরে, নিজে কানে শুনে এভাবে জেকের করতে হবে।

প্রথম প্রথম এই সবক করতে গেলে উজান ঠেলতে হবে, লোকে সমালোচনা করবে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেয়া নিস্প্রয়োজন, কারণ একের কবরে অন্যে যাবে না। সবকের সময়ে কু-খেয়াল অথবা সবকে তাছির না হলে, বামদিকে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম' পড়ে থু থু করে শব্দ করতে হবে (থু থু ফেলার দরকার নেই)। সবকে তাছির না হলে অথবা সবক করতে মনে যদি না লয়, তবে জোর করে মাত্রা বাড়িয়ে সবক আদায় করতে হবে। জোর করে মিষ্টি খাওয়ালে কি মুখে মিঠা লাগে না? জোর করে ওষুধ খেলে কি বিমারি ভাল হয় না? আল্লাহ্র নাম যাতে মুখে না উঠে, তার জন্য শয়তান অনবরত পেছনে তো লেগেই আছে, একথা যেন মনে থাকে।

দ্বিতীয় সবক

নফি এছবাত বা বার তস্বির সবক

এই সবকে বসে প্রথমে চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রেখে প্রথম সবকের মত মরণের খেয়াল করবেন এবং মনকে বুঝিয়ে বলবেন যে, কত মানুষ কবরে গেল, তোমাকেও কবরে যেতে হবে! মরণের পরে অনন্তকালের জীবনে যার সঙ্গে থাকতে হবে, দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে ভালবাসা করে না গেলে, অন্ধকার কবরে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে! এইভাবে উত্তমরূপে মরণের খেয়াল করে পড়বেন ঃ

দরূদ শরীফ-	৫ (পাঁচ বার)
আসতাগফিরুল্লাহ-	১১ (এগার বার)
সোবহানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় প্রত্যেকবারই খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহ্র দিকে চেয়ে আছি, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি আল্লাহ্কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়া কয় (বলেন), বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন"। যদি কোন সময় পূর্ণ একশো বার নাও বলতে পারেন, তবে 'সুবহানআল্লাহ্' তেত্রিশ, 'আল্হামদুলিল্লাহ' তেত্রিশ, 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার বলবেন। কিন্তু হালকায়ে জিকিরের দিন পূর্ণ একশত বার করে বলতে হবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ২০০ (দুইশত বার)

দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন- **আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই**।

অথবা যদি কেহ পারেন, তবে নিম্নোক্ত খেয়াল করতে পারেনঃ

'লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ্-লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাশুকা ইল্লাল্লাহ্' অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন, যখন "লা" শব্দ বলবেন তখন খেয়াল সাত তবক আসমানের উপরে নিয়ে দেখবেন, কোথাও আল্লাহ্ নেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেয়াল জমিনের দিকে আনবেন এবং হাজার হাজার মাইল জমিন সব ঘুরে আসবেন এবং খেয়ালের দৃষ্টিতে দেখবেন জমিনেও আল্লাহ্ নেই অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন "লা" শব্দ যখন বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন, জমিন নেই, আসমান নেই, আমার শরীরও নেই, কিছুই নেই, শুধু আল্লাহ্ই আছেন।" এখন আল্লাহ্ কোথায় আছেন, হাদিস শরীফের মতে ক্বল্ব হল আল্লাহ্র আরশ সুতরাং এখন খেয়াল কল্বের দিকে নেবেন এবং একিনের চক্ষু দ্বারা ক্বল্বের দিকে নজর করলে দেখবেন, আমার ক্বল্বে আল্লাহ্ই

আছেন। অথবা অন্য রকম খেয়ালও করতে পারেন "বেহেশ্ত দোজখ আরশ কুরছী লওহ্ কলম সাত তবক আসমান জমিনে কোথাও আল্লাহ্ নেই, কিন্তু একিনের চক্ষু দিয়ে ক্বল্‌বের উপরে নজর করে দেখবেন, আল্লাহ্ আমার ক্বল্‌বেই আছেন। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য এই সমস্ত খেয়াল না করা ভাল। তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" অর্থ খেয়াল করবেন, "আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই।" প্রথম সবকের নিয়ম অনুযায়ী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন। তারপর-

ইল্লাল্লাহ্- ৪০০ (চারশত বার)

ইল্লাল্লাহ্‌র মানে খেয়াল করবেন, **"আমার ক্বলবে আল্লাহ্‌ই আছেন"**।

বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্‌লিয়ে আটকিয়ে না যায়। আকায়েদের মাসআলা নিয়ে বেশী হুলাহুলি করবেন না, তাহলে সবকের আসল মর্ম বুঝতে পারবেন না। শুধু আকায়েদই হাসিল হবে, আল্লাহ্ হাসিল হবে না। কারন, যুক্তিতে তাকে পাওয়া যায় না, ভক্তি রসে অবগাহিত হয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। এরপর

আল্লাহ্ আল্লাহ্- ছয়শতবার

'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলার সময় কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখবেন, এই দৃষ্টি যেন নড়াচড়া না হয় এবং খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমাকে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন?" এই ডাকের জবাব শুনার জন্য দেলের কান সজাগ রাখবেন এবং বিশ্বাস করবেন। হাদিস শরীফে আছে, আল্লাহ্ পাককে একবার ডাক দিলে, আল্লাহ্ পাক **১০** বার ডাকের জবাব দেন। পরে **৫ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত করবেন।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

১। জেকের করতে করতে কান্না আসে।
২। আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার জন্য মনে উদাসীন ভাব আসে।
৩। সুন্নতের তাবেদারী করতে মনে ইচ্ছা করে।
৪। শরীয়তের জন্য কুর'বান হতে মনে চায়।
৫। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' নূরানী নকশায় রূহানী নজরে দেখা যায়।
৬। ক্বল্‌বের মধ্যে 'ইল্লাল্লাহ্‌র' নূরানী নকশা দেখা যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কে যেন নিরবচ্ছিন্ন জেকের করে মা'লুম হয়। আর কোন কোন সময় মনে হয়, অনেক দূর হতে আল্লাহ্‌র জিকিরের শব্দ অজস্র ধারায় ভেসে আসে।
৭। কোন কোন সময় জিকির করতে করতে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

তৃতীয় সবক

হাব্‌সে দম

এই সবকে বসে মওতের খেয়াল করার পর, দ্বিতীয় সবক বা নফি এছবাতের সবকের অর্ধেক আদায় করবেন অর্থাৎ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্- ১০০ (একশত বার)
ইল্লাল্লাহ্- ২০০ (দুইশত বার)
আল্লাহ্ আল্লাহ্- ৩০০ (তিনশত বার)

তারপর সবক বন্ধ করে দিয়ে, চুপ করে বসে খুব খেয়াল করে একটা লোক মরণ থেকে কবরে নিয়ে মাটি দিয়ে আসা পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খুব খেয়ালে খেয়ালে চিন্তা করতে থাকবেন। প্রথম সবকে মরণের যে খেয়াল করা হয়েছে, সেই সমস্ত খেয়াল করে খুব গভীরভাবে মনকে বুঝাবেন যে, মন এখন চিন্তা করে দেখ, তুমি বাড়ীর উঠানে নেমে উত্তর শিয়র হয়ে আছ, এখন তোমাকে গোসল দেয়া হয়, কে কে গোসল দেয় খেয়াল করবেন, এখন তোমাকে কাফন পরিয়ে জানাজা দিয়ে দুয়ারে শুইয়ে রাখা হয়েছে, তোমার বিবি এখন সাদা কাপড় পরে বিধবা বেশে নাকের সোনা, হাতের চুঁড়ি খুলে তোমার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদে আর বলে, আমায় তুমি কি দিয়ে গেলে? এখন খেয়াল করেন, আপনাকে কবরের দিকে নিয়ে যায়, আপনার ছেলেমেয়েরা পেছনে দৌড়ায় আর 'আব্বা আব্বা' বলে কাঁদে। এরপর খেয়াল করবেন, আপনার মরণের খাট নিয়ে কবরের এক পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কবরে নামানো হল। এখন আপনার সন্তান আপনাকে কবরে রেখে লাফিয়ে কবরের উপরে উঠল। কিতাবে আছে, সন্তান যখন পিতা-মাতাকে কবরে রেখে উঠে আসতে চায়, তখন ঐ পিতামাতার রুহ্ সন্তানের পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, বাবা আমাকে একলা ফেলে যেওনা। এখন আপনার কবরের উপরে মাটি ফেলে চাপা দেয়া হল, সবাই বিদায় হয়ে গেল। এখন মুন্‌কার নাকীর দু'জন ভীষণ দর্শন ফেরেশ্‌তা কবরে হাজির হল, তাদের হাতে গুর্জ্জ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন, সারা দুনিয়ার জ্বীন এবং মানুষ একত্রে চেষ্টা করলেও একটি গুর্জ্জকে একটুও নড়াতে পারবে না। এখন ফেরেশতা দু'জন গুর্জ্জ উঠিয়ে আপনাকে বসিয়ে আপনার ডান এবং বাম কাঁধের দিকে দাঁড়িয়ে আপনাকে সওয়াল করতে উদ্যত হল, আপনি এখন খেয়াল করবেন যে, তাদের সওয়ালের জবাব দিতে না পারলে, এই অন্ধকার কবরে গুর্জ্জের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব। আপনি এখন মনকে বুঝাবেন, মন! এই ভীষণ অন্ধকার কবরে এখন তোমার কে আছে, চিন্তা কর! এখন তোমার আল্লাহ বিনে কোন বান্ধব নেই, এই খেয়ালে আপনি এখন তসবিহ্ হাতে নিয়ে একদমে যতবার পারেন

আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত আকুলভাবে ডাকবেন এবং দম বন্ধ করে ঘন ঘন করে বলবেনঃ

আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌..............আল্লাহ্‌ - ২১ দমে ২১ (একুশ) **বার** বলবেন। বলতে বলতে দেখবেন এক দমে কতবার 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলতে পারেন। দ্বিতীয় দমে প্রথম দমের চেয়ে আরও কিছু 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করবেন। এইভাবে ২১টা দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলবেন, বলতে বলতে শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে, তবু বলা থামাবেন না। এক দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' যত বেশী মাত্রায় বলতে পারবেন, সবকে তত বেশী তাছির পাবেন। দিনে রাতে দমে দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌'র মাত্রা বাড়িয়ে বলতে থাকবেন এবং এক দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলতে বলতে এই কাজটি শেষ করতে পারি কিনা, বা এই গাছ থেকে ঐ গাছ পর্যন্ত এক দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলে হেটে যেতে পারি কি না, খেয়াল করবেন সবকের সময় এমনভাবে আল্লাহ্‌ বলবেন, যেন মুনকার নাকীর আপনাকে প্রশ্ন করার সময় না পায় এবং 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলা যেন মুহূর্তের জন্য বন্ধ না হয়, আল্লাহ্‌কে ডাকতে ডাকতে যেন কিয়ামত জারী হয়ে যায়।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

* জেকের করতে করতে কোন সময় দেখবেন, ঘুম হতে জাগ্রত হলেও আপনার জিহ্বা আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একা একা নড়াচড়া করে আল্লাহ্‌র জিকিরে রত আছে।
* খেয়াল করলে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্ট বস্তু থেকে আল্লাহ্‌ জিকির স্পষ্ট শুনতে পাবেন। বিবিকে খাছ পর্দা করে এবং সুন্নতি লেবাস নিয়ে এই জিকির বেশী মাত্রায় করলে, দেহের ছত্রিশ কোটি পশমের গোড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র জিকির বের হতে থাকবে, আখেরাত এবং কবরের অন্ধকারের কথা প্রাণে সদা জাগ্রত থাকবে। এই সবকে ভেতরের হালাত কোন কোন সময় এরকম হবে, দেখবেন, নাভী হতে দেহের উপরের অংশ কোটি কোটি মাইল উর্ধ্বদেশে উঠে গিয়েছে। নাভীর নিচের অংশটুকু জমিনে পড়ে আছে। আরও অন্যান্য হালত হবে, যেগুলো বর্ণনা করা নিষেধ।

এ সবকগুলোর পরে আরও **সতেরটি সবক** রয়েছে। যেগুলো করলে মানুষের কি যে হালত হয় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে যে কি রকম গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা বই পুস্তকে লিখে মোটেই প্রকাশ করা যাবে না।

বিঃ দ্রঃ সবকের অধ্যায়ে যে সবক লিখা হয়েছে, তা থেকে প্রথম সবক করার এযাযত দিলাম। এই সবক করতে করতে যদি কারো চোখে পানি আসে এবং দিল পরিবর্তন হয়, তাহলে এ গোলামের গরীবালয়ে যোগাযোগ করে এলমে মা'রেফতের উপরের নেয়ামতের সবক নেবেন।

- **মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে প্রতি বাংলা মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয় ও এল্‌মে মা'রেফতের শিক্ষা দেয়া হয়।**

- **বছরে দু'বার এলমে মা'রেফতের ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫, ৬, ৭ অগ্রহায়ণ ও ১০, ১১, ১২ই ফাল্গুন। (প্রয়োজনে তারিখ পরিবর্তন করা হয়)।**

- **প্রতি ইংরেজী মাসের ৩ ও ৪ তারিখে সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্‌কা শরীফে ইসলামী মাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়।**

কুতুব-উল-আকতাব অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)
এর বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাওয়ার রাস্তা
ঢাকা আরিচা রোডে মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে নেমে রিকশায় সিদ্দিক নগর।
ফোন ঃ ০৬৫১ - ৬১৩৪৮

সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খানকা শরীফে যাওয়ার রাস্তা
স্বাধীনতা স্বরণী সড়ক, উত্তর বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা। ফোন ঃ ৮৮২ ৭৩৩২
(উত্তর বাড্ডার মেইন রোডের পার্শ্বে হোসেন মার্কেট থেকে বামে স্বাধীনতা স্বরণী রোডের মাঝামাঝি । উপশম হাসপাতালের বিপরীতে)

দু'টি কথা

ধর্মের মূল হচ্ছে বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে কয়েকটি বিশ্বাস না থাকলে তাকে ঈমানদার বলা যাবে না এবং সে কাফের হবে। যেমন কবর আযাব কেউ বিশ্বাস না করলে সে কাফের হবে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কে বিশ্বাস না করলে তার কোন নেক আমলই কাজে আসবে না। এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোক জাহেলদের মত চিন্তা ভাবনা করে বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবী ছিলেন না, কবি ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্)। কেননা তিনি যে বলেন কবর আযাব সত্য কিন্তু তিনি আরো বলেন কৃপণ ব্যক্তিকে সাপে কিয়ামত পর্যন্ত কামড়াবে যে সাপটির বিষের চোটে চক্ষু নীল হয়ে গেছে এবং মাথার পশমগুলো পড়ে গেছে। একটা লোকের মৃত্যুর পর হাড়গুলো মাটিতে মিশে যায়। ঐ লোকটার বুকটা কোথায় থাকে, সাপটাইবা কোথায় দংশন করে। এ ছাড়া হিন্দুরা পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দেয়। এই ধরণের মন্তব্য নাস্তিকেরা ও তথাকথিত জ্ঞানান্ধরা করে থাকে। এই সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তির সদুত্তর নিখাঁদ বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে একটি বই লিখে দিয়েছি। তার নাম "মহাস্বপ্ন"।

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

বাংলাদেশ (Bangladesh)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮
E-mail: sfbd786@mailblocks.com

ঢাকা কার্যালয়
সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খানকা শরীফ
স্বাধীনতা স্বরণী সড়ক, সিদ্দিকনগর, বাড্ডা, ঢাকা
ফোনঃ ৮৮২৭৩৩২

জামি'আ আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮

মডার্ন বুক সেন্টার
১, মিরপুর রোড (ইসলামিয়া মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ৮৬১৯৭৯০

সোনিয়া মেডিকেল বুক হাউজ
২৪, মিরপুর রোড, (ইসলামী মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ০২-৮০১৪৩৫

কুষ্টিয়া সীড স্টোর লাইব্রেরী
(মিরপুর ১১ নং বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন) ঢাকা
ফোনঃ ৮০১১৪৩৫

ভূঁইয়া কনফেকশনারী
পূরবী সুপার মার্কেট, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা
ফোনঃ ০১৭১-১৪৮৫০৮

উজ্জ্বল বই বিতান
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১২ ৩৬০৪

অফিস ইন্টারলিংক
২৭১/১ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
ফোনঃ ৮১২ ০০১৭, ৮১৫ ০১৭০

আবদুল্লাহ্
জেনেসিস প্রাঃ লিঃ
৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা
ফোনঃ ০১৮-৪৯৩৬৩৭
E-mail: genesisl@bdcom.com

INDIA (ভারত)

Techno World
(Exclusive Distributor in India)
Block B, Shop 54, College Street Corpn.
Market, Kolkata-700 007 (Beside Bibhuti Hotel)
Tel: 91-33- 2219-6116
E-mail: technoworld786@vsnl.net

UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd.
8/1-B, Chowringhee Lane, Kolkata-700 016
Tel: 91-33-22521821, 22522910,
Fax: 91-33-22523027
E-mail: ubspdcal@cal.vsnl.net.in

National Book Store
15, Bankim Chattojee Street, Kolkata-700 073
(Opposite of Kolkata Presidency College)

Sarvodaya Book Stall
Howrah Station
(Old Complex, Near Main Enquiry)
Howrah-711101 (W.B)

Biswas Book Stall
88 U. G. Road, Kolkata-700 009

International Book Trust
54 College Street, Kolkata-700 073

M/s. Preface Books
Mumbai, India

UBSPD
New Delhi & Bangalore

ITALY (ইটালী)

Rashid Communications
VIA Goito, 7/a, 40126 Bologna
Italy, Tel: 051-273021

Carto Livreria
VIA - La- Marmora - 16
0085 Roma
ITALY, Tel: 06-441133

লেখকের গ্রন্থসমূহ

❒ **মহাভাবনা** (MOHA VABNA) **(স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)**
এ মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বে এই প্রথম মহান আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ (The World Challenge) করা হয়েছে, যা বিশ্বের নাস্তিকরদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে । কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মীয় এ মহাকিতাবে মহাসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), গণিত (Mathematics), ইত্যাদির আলোকে আলোচনা করেছেন। এতে জ্ঞান পিপাসু মানুষের জ্ঞানের সন্ধান রয়েছে।

❒ **মহাস্বপ্ন** (MOHA SHAPNA)
হুজুরপাক (সাঃ) এর পর থেকে প্রায় ১৫শত বছর পর তাঁর একটি সহি হাদিস শরীফের সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রমানের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing and one man divided into core of cores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings) আবিষ্কার করেছেন যা বিজ্ঞানের মতধরাকে পরির্বতন করবে। মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুড়িয়ে, মুসলমান ও খৃষ্টানরা মাটিতে গলিয়ে দিলেও কিভাবে কৃপন ব্যক্তির বুকে সাপে কামড়ায় তার প্রমাণ করা হয়েছে।

❒ **জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব** (JIBON RAHASHA O DEHA TATTA)
জীব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্‌পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্‌পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

❒ **বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা** (BIGGANER DRISTITAY PARDA)
বেপর্দা নারীর স্বামীর কি যে সর্বনাশ হয় এবং সে কিভাবে যে অতিসত্বর পুরুষ-ত্বহীন হয়ে পড়ে তা বিজ্ঞান এবং ডাক্তারী শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ কিতাব পড়ে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জ ীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছেন। এমনকি অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত বোরখা পরে পর্দা করা শুরু করেছেন।

❒ **ধূম পিপাসা সর্বনাশা** (DHUM PIPASA SHARBANASHA)
ধূমপান করলে কি সর্বনাশ হয়, ডাক্তারী শাস্ত্রে তা দেখানো হয়েছে। ধূমপান করলে যে ক্ষতি হয়, তা নষ্ট করার কায়দা দেখানো হয়েছে এবং কি উপায়ে ধূমপান করলে ক্ষতি হয় না এবং ধূমপান কিভাবে ত্যাগ করা যায়, তার একটি অব্যর্থ উপায় লিখে দেয়া হয়েছে। এটা বহু পরীক্ষিত।

❒ **পীর ধরার অকাট্য দলিল** (PEER DHARAR AKATTA DALIL)
অনেকে বলে, পীর ধরার দরকার নেই। এসব কথার সদুত্তর কুর'আন শরীফ থেকে অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পীর না ধরলে মানুষ আল্লাহ্‌কে চিনতে পারবে না এবং মা'রেফতের জ্ঞান লাভ করতে পারবে না, অবশ্য আল্লাহ্ পাক ইচ্ছে করলে সবই পারেন। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্‌র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করা হয়েছে।

❒ **তারানায়ে জান্নাত** (TARANA- A- JANNAT)
বিচ্ছেদ বেদনাতুর হয়ে ঝংকৃত, কাব্যিক রসে স্নাত, ছন্দের দ্যোতনায় আপ্লুত অতি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব যা সালেককে আল্লাহ্‌পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। মা'রেফত পন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব এই বইটিতে গজল আকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

❒ **মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব** (MAREFATER VEDTATTA)
মা'রেফতপন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্বসম্বলিত ও চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার সবকসমূহ এবং সাজরানামা সম্বলিত কিতাব। এটি সালেকদের পাঠ্য বই।